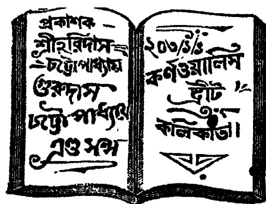
আট-আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার নবতিতম গ্রন্থ

চিরকুমার

শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় এম-এ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রাবণ—১৩৩০



প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পূজনীয়

পিতৃদেব

৺ ডাঃ কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায়

শ্রীচরণেষু

বেহালা
৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৩০

চিরকুমার

১

মাঘের বসন্ত-হিল্লোলে সমস্ত পল্লীটা পাগলের মত মাতিয়া উঠিয়াছে! আকাশে দু'একখানা লঘু মেঘখণ্ড, বাতাসে একটা প্রাণ মাতানো শিহরণ, কাননে বিহঙ্গের কল-কূজন, গাছে পাতায় একটা নূতন সজীবতা মধুমাসের প্রথমেই প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। নয়ানপুর গ্রামের একটা পুষ্করিণীর পাড়ে মস্ত একটা কুলগাছ কুলের গুচ্ছে ভরিয়া উঠিয়াছে। সেই কুলগাছের তলায় প্রায় দশ বারোটী ছেলে পাঠশালা পালাইয়া কুল পাড়িতেছে। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছেলেটীর বয়স প্রায় সতেরো। সেই বোধ হয় দলের সর্দ্দার। সে সকলকে উৎসাহিত করিতেছে, কুল পাড়িতে সাহায্য করিতেছে, কিন্তু সে নিজে একটীও কুল গ্রহণ করে নাই। তাহার এই উদারতা দেখিয়া সমবয়স্কেরা সকলেই ব্যঙ্গ কৌতুক করিতে লাগিল।

'হিরণ্ময়, তুই ফুল নিলিনা কেন, ভাই ?'

'এখন কি ফুল খেতে আছে রে বোকা, এখনও যে সরস্বতী পূজো হয়নি !'

'কি সর্ব্বনাশ, তুই নিজে সাধু রইলি, আর আমাদের সব মাথা খেলি, হিরু !'

সকলেই কোঁচড় হইতে ফুল ফেলিয়া দিল। কাহারও মনে আর একটুও উৎসাহ রহিল না। সরোবরের উপর প্রভাতের শীত সমীরণ-স্পর্শে তখন কুঁদফুলগুলি ধীরে ধীরে দুলিতেছে, মধুমত্ত মক্ষিকা সেই ফুলগুলির উপর নাচিয়া নাচিয়া উড়িতেছে, বায়ুকম্পিত একটী পদ্মের নিকট নির্ম্মম-ভাবে প্রত্যাখ্যাত হইয়া আবার অন্যটীর কাছে গিয়া বসিতেছে। হিরণ্ময় হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া বলিল, 'আজ আর আমি স্কুলে যাবো না ভাই, আমার বাড়ীতে কাজ আছে, আমি চললুম।'

হিরণ্ময় একটী সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া একেবারে তাহাদের কুটীর-প্রাঙ্গণে গিয়া উপস্থিত হইল। দুইখানি বড় বড় খড়ের সুন্দর আটচালা, পাশে একটা গোয়াল-ঘর। তাহার বিধবা মাতা মোক্ষদাসুন্দরী তখন গৃহমার্জ্জনে ব্যস্ত। তিনি হিরুকে হঠাৎ চোরের মত সন্তর্পণে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বলিলেন, 'কি রে, হিরু, এতক্ষণ কোথায় ছিলি তুই ?'

'দত্তদের গাছে কুল পাড়ছিলুম।'

জননী কঠোর কণ্ঠে কহিলেন, 'সে কি, এখনো সরস্বতী পূজো হয়নি, ভট্‌চায্যির বংশধর হয়ে তুই কেমন করে কুল খেলি?'

'না মা, কুল খাইনি, কুল পাড়ছিলুম।'

'হিরু, আজকাল দেখছি লেখাপড়ায় তোর আস্থা কমে যাচ্ছে। কি মনে করেছো বাবা জানি না। আমাদের অবস্থা কি তুই জানিস না? তোকে সেই পাঁচ বছর বয়স থেকে মানুষ করেছি কত কষ্টে, আর তুই যদি নিজের বংশ-মর্য্যাদা ভুলে কেবল ছোটলোকের ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে শুধু পথে পথে ঘুরে বেড়াবি, তাহলে আর কোন্‌কালে মানুষ হবি! আমি আর তোর কোনো কথার ভিতর থাকবো না, বাছা!' এই বলিয়া মাতা ক্রুদ্ধমনে অন্য কাজে চলিয়া গেলেন।

হিরণ্ময়ের পিতা হেমচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় এই নয়ানপুর গ্রামের ও আরও সাত আটটা নিকটস্থ গ্রামের কুল-পুরোহিত ছিলেন। তাঁহার পরোপকারিতার গুণে মুগ্ধ হইয়া সকলেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিত। গ্রামের মধ্যে তিনি আদর্শ পুরুষ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিত্ব, আত্মশক্তি ও চরিত্রবলের জন্য সকলেই তাঁহাকে ভয় করিয়া

চলিত। এই আচারনিষ্ঠ, ব্রাহ্মণোত্তম, উদারচরিত পুরোহিত মহাশয় শুধু যজমানি করিয়াই জীবন কাটান নাই, তিনি একজন দেশ-বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। দেশবিদেশে তাঁহার আহ্বান হইত, বড় বড় সভায় তাঁর সম্মানের আসন ছিল, ধনী জমীদারগণ তাঁহাকে সমাদর করিয়া গৃহে আমন্ত্রণ করিতেন। একদিন দূরদেশ হইতে বিজয়মাল্য পরিয়া আসিয়া তিনি শয্যা লইলেন ও সেইদিন হইতেই বিষম জ্বরে পড়িয়া সপ্তাহের মধ্যে নিজ সাধনোচিতধামে চলিয়া গেলেন। স্ত্রী মোক্ষদাসুন্দরী আদর্শ গৃহিণী ছিলেন ; স্বামীর প্ররোচনায় তিনি সংস্কৃতও একটু শিখিয়াছিলেন ; সুতরাং তিনি সুধু হেমচন্দ্রের গৃহিণীমাত্র ছিলেন না,—কালিদাস কথিত ইন্দুমতীর ন্যায় তিনি সচিব, সখী ও ললিতকলায় প্রিয়শিষ্যা ছিলেন। ছোট একটী বালক লইয়া মোক্ষদাসুন্দরী সংসারের বেলাভূমিতে আবদ্ধ হইয়া রহিলেন,—তাঁহার দেশপূজ্য স্বামী জন্মান্তরের পথে সাধনার তরণী ভাসাইয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার সংসারে আপনার বলিতে আর কেহ রহিল না। কিন্তু মোক্ষদা দৃঢ়বুদ্ধি রমণী, তাঁহারও উচ্চবংশে জন্ম। তিনি বজ্রের মত কঠোর হৃদয়ে একবিন্দুও অশ্রুপাত না করিয়া হিরণ্ময়ের দ্বারা প্রিয়তম স্বামীর আন্তকৃত্যাদি করাইলেন। হেমচন্দ্র

জীবিতকালে উপায়ও বড় কম করেন নাই; কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর দেখা গেল যে, সামান্য পৈত্রিক ভিটাখানি ছাড়া তিনি আর বেশী কিছু রাখিয়া যান নাই। সর্ব্ব-বিষয়েই তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন,—একবার 'না' বলিলে সারা ভুবনও তাঁহাকে 'হাঁ' বলাইতে পারিত না।

মোক্ষদার উপর হিরণ্ময়ের আবাল্য শিক্ষার ভার ছিল। আজ ফুল পাড়িবার উচ্ছ্বাসে হিরুর মনেই ছিল না যে, সরস্বতীপূজা আগত-প্রায়। যখন মনে হইল, তখন তার মন অনুতাপ বেদনায় ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল। সে ফুল ফেলিয়া শুধু চলিয়া আসিল না, মাতার নিকট সব দোষ স্বীকার করিয়া তবে মনে শান্তি পাইল। কিন্তু সেদিন সে স্কুলে গেল না। ক্লাশের সেই সর্ব্বোত্তম ছাত্র, তাহার মেধা ও বুদ্ধির গুণে স্কুলের সব শিক্ষকগণই চমৎকৃত। সেইজন্য তাহাকে এ পর্য্যন্ত কথনো বেতন দিয়া পড়িতে হয় নাই। স্কুলের দরিদ্র সহপাঠীগণ হিরুর নিকট নানাপ্রকারে উপকৃত হইত তাহার মাতা হাসি মুখে সকলকে সাহায্য করিতেন। প্রায় তিন বৎসর হইল তাহার উপনয়ন হইয়া গিয়াছে; পৈত্রিক শিষ্য-সামন্তগণের গৃহে সে সামান্য কাজ গুরু-গিরিও করিত। মোক্ষদাসুন্দরী গৃহ-সংলগ্ন বাগানটীতে নানাপ্রকার শাক-সবজী ও ফলের গাছ রোপণ করিয়া

সংসারের অর্থকৃচ্ছ্রতা যথাসম্ভব দূর করিতেন। কিন্তু এই দুঃস্থ পরিবারটীকে পরের নিকট কেহ কখনো হাত পাতিতে দেখে নাই। গ্রামের মুখোপাধ্যায়-বংশ সুপ্রাচীন জমীদার,—হেমচন্দ্র তাঁহাদের কুলপুরোহিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বৃদ্ধ যদুনাথ মুখোপাধ্যায় একটী বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম হিরুর নামে লেখাপড়া করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। মোক্ষদা জমীদার-গৃহিণী জীবনকুমারীকে প্রণাম করিয়া বলিয়া আসিয়াছিলেন, 'দিদি, কর্ত্তাকে বলবেন, আমার হিরুর মাথাটী যেন না খান।' গিন্নী বলিয়াছিলেন, 'সে কি কথা ভট্চায্যি বউ? ষাট্ ষাট্।' 'না দিদি, হিরু আমার বেঁচে থাক, বেটাছেলে, বুদ্ধি আছে—বুদ্ধি থাকলে পয়সার দুঃখ কি? আর ভট্টাচার্য্য-বংশের কেহ কখনো পয়সার জন্য পরের অন্নদাস হয়নি।' কথাটা মনে মনে জমীদার-গিন্নী তারিফ্ করিলেও তিনি এই মা ও ছেলের উপর বড়ই চটিয়া গিয়াছিলেন। সেইদিন হইতে আর তিনি তাঁহাদের কোনই খবর লন নাই।

কিশোর হিরণ্ময়ের বাস্তবিক হিরণ্য-দ্যুতির মতই সৌন্দর্য্য ছিল। তাই তাঁহার পিতৃদেব আদর করিয়া শৈশবকালে তাঁহাকে 'দেবকুমার' বলিয়া ডাকিতেন। সুন্দর সুগঠিত পূর্ণায়ত অবয়বে সেই সুবর্ণ-বর্ণ বড়ই

অপরূপ বলিয়া মনে হইত। ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ-দাম, আকর্ণ-বিশ্রান্ত নয়ন, অরুণাভ কপোল, অধরোষ্ঠের সে লীলায়িত গতি,—তাহাকে একবার দেখিলে আবার দেখিতে ইচ্ছা করিত। তাই পাড়ায় তার এত আদর, এত সুখ্যাতি। সকলে বলিত, 'হেম ভট্‌চাযিয়র এই ছেলে একদিন রাজা হবে,—তার হাতে রাজ-চক্রবর্ত্তার চিহ্ন আছে।' মোক্ষদা সে সব কথা কানেও তুলিতেন না। এমন রাজপুত্রের মত সন্তান, এই বয়সেই বিদ্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছে, তবু হিরু মার কাছে কোন দিনই প্রশংসা বা উৎসাহের বাণী শুনিতে পায় নাই। সেই কঠোর আদেশের স্বর,—হিরণ্ময়ের তাহাই ভাল লাগিত। এত দুরবস্থার মধ্য দিয়া মোক্ষদা ও হিরণ্ময় কাল কাটাইতেছে, কিন্তু তবু পাড়ায় কাহারও কোন বিপদ হইলে সে সর্ব্বাগ্রে তাহাদেরই সাহায্য খুঁজিবে। অথচ তাহাদের কতটুকুই বা ক্ষমতা!

কুলপাড়ার পরদিন অপরাহ্নে স্কুল হইতে আসিবার সময় হিরণ্ময়ের নেতৃত্বে একদল ছেলে উচ্চ কলরব করিতে করিতে বাড়ী ফিরিতেছে। রামগতি নামে হিরুর একজন সহপাঠি বন্ধু হঠাৎ অজ্ঞাতসারে একটা লোকের গায়ের উপর পড়িয়া গেল। অপ্রকৃতিস্থ ছিল বলিয়া সে লোকটাও

টলিতে টলিতে আসিতেছিল। এই আকস্মিক সংঘর্ষের ফলে সেই মাতালটা রাস্তায় পড়িয়া যাইবামাত্র সমগ্র ছেলের দল 'হো, হো' করিয়া হাসিয়া উঠিল। মাতাল মহাশয় এই তীব্র শ্লেষ সহিতে না পারিয়া হাতের লাঠি দিয়া রামগতিকে দারুণ প্রহার করিল। রামগতি কাঁদিতে লাগিল, ছেলের দল পশ্চাৎপদ হইল। কেবল একা হিরণ্ময় বন্ধু সবোজের হাতে বইগুলি দিয়া রক্ত চক্ষে সেই মাতালের সম্মুখীন হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি! মাতলামি করার আর যায়গা পাওনি! —বলিয়াই তাহার গণ্ডে সজোরে এক চপেটাঘাত করিল। মাতাল জ্ঞানহীন হইয়া পড়িয়া গেল। পাড়ার কয়েকজন লোক যখন সেখানে সমবেত হইল, তখন ছেলের দল ও হিরু যে যাহার গৃহে পৌঁছিয়াছে।

বাড়ীতে আসিলে তাহার ঘর্ম্মাক্ত ও গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া জননী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি গো গুরুঠাকুর, আজ এমন চেহারা কেন?'

হি।—মা, রাস্তায় মাতলামি করে যদি কেউ অন্যায়-ভাবে আমার বন্ধুকে মারে, তবে আমার তখন কি কর্ত্তব্য বলে দাও দেখি!

মো।—ন্যায় অন্যায়ের কথা জানি না, বাছা, দরকার

হলে বন্ধুর জন্য বন্ধু প্রাণ পর্য্যন্ত দেয়—এ কথাও কি বুড়ো বয়সে তোকে শেখাতে হবে, হিরু!

হিরুর চক্ষু আনন্দে জ্বলিয়া উঠিল। সে দৌড়িয়া গিয়া মাকে সাদরে জড়াইয়া ধরিয়া অপরাহ্নের সমস্ত ঘটনাটী আদ্যোপান্ত তাঁহার নিকট বর্ণনা করিল। মাতা শুধু একবার অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া উঠিলেন। ক্রমে পাড়ার লোকের মুখে মোক্ষদা শুনিলেন যে যদুবাবুর নায়েব পুত্র ধনঞ্জয়, হেম ভট্চায্যির ছেলে হিরুর দ্বারা নির্ম্মমভাবে প্রহৃত হইয়াছে।

সন্ধ্যার আঁধারে হিরু শয্যার নিকট বসিয়া ইংরাজী পড়িতেছে এমন সময় মোক্ষদা আসিয়া বলিলেন, 'হিরু, তুই কি আমায় বাঁচতে দিবিনি! আমি কি তোর পায়ে মাথা খুঁড়ে মরবো?'

হিরু হাসিয়া বই ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'না মা, তুমি মরে যেও না মা, আমায় তাহলে কার কাছে রেখে যাবে মা?'

মো।—চুপ কর হিরু, আমি তোর ছেলেমানুষী শুনতে চাইনি। যদুবাবুর নায়েবের ছেলেকে তুই আজ মেরেছিস, এইমাত্র পেয়াদা এসে আমায় বলে গেল যেন খোকাবাবু কাল সকালে রাজাবাবুর সঙ্গে দেখা

করে আসেন—জরুরী তলব। বাইরের ঝগড়া ঘরে এনে এখন জেল খেটে মর!

হিরু হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, 'মা তুমি না কাল আমায় বলেছিলে—দরকার হলে বন্ধুর জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দেয়? আজ জমীদারের পেয়াদা দেখে তুমি একেবারে ভয় পেয়ে গেলে? আমি ভয় পাবার ছেলে নয়। সত্য কথা বলে' জেলে যাবো—এই ত তুমি আমায় শিখিয়েছ মা। মিথ্যা বলে' কেমন করে জেলে যেতে হয়—এবার তাই না হয় শিখিয়ে দাও!

মো।—না হিরু, আমি তোর কাজের নিন্দা করছি না, ধনার বাবা যদু মুখুয্যের ডান হাত। সে যদি তোর বিরুদ্ধে কোন কথা জমীদারকে জানায়, তাহলে সে একটা হৈ চৈ না করে ছাড়বে না। এখনও যে তুই বাছা শিশু, তুই বড় হলে কি আমার ভাবনা ছিল?

হিরু, জননীর পদধূলি মাথায় দিয়া বলিল, 'মা, আমায় আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন বাবার পায়েরও যোগ্য হতে পারি।'

সন্ধ্যার স্তিমিত অন্ধকারে দাঁড়াইয়া অশ্রুমুখী মোক্ষদা বলিলেন, 'হাঁ, বাছা, তোকে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করছি'—বলিয়া হিরণ্ময়ের মুখচুম্বন করিলেন।

২

প্রভাতে দ্বিতলের প্রকাণ্ড হল্‌ঘরে বৃদ্ধ জমীদার রায় যদুনাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের কাছারী বসিয়াছে। সে ঘরটী বহুলোকে পরিপূর্ণ। একখানি লৌহের চশমা চোখে দিয়া নিবিষ্ট মনে তিনি গোমস্তার সঙ্গে তর্কবিতর্ক করিতেছেন, আর তাঁর প্রিয়তমা দৌহিত্রী সুধারাণী পশ্চাদ্‌ভাগে দাঁড়াইয়া বুড়া দাদামহাশয়ের মাথার পাকা চুল তুলিয়া দিতেছে। সুধারাণীর বয়স দশ বৎসরমাত্র,—কিন্তু তার দেবতা-দুর্লভ অনিন্দনীয় রূপ দেখিয়া সকলে তাহাকে লক্ষ্মী বলিয়া ডাকিত। দাদামহাশয়েরও আদরের ডাক 'লক্ষ্মী'। কিন্তু এ লক্ষ্মীটী বড় চঞ্চলা, বড় দুষ্ট! তাই দাদামহাশয় সর্ব্বদা ইহাকে চোখে চোখে রাখিতেন। কিছুক্ষণ চুল তোলা হইলে সুধা তাহার 'বোধোদয়' খুলিয়া পড়িতে বসিল—'পুত্তলিকার চক্ষু আছে দেখিতে পায় না, মুখ আছে খাইতে পারে না, নাসিকা আছে গন্ধ পায় না, হস্ত আছে কোনও কর্ম্ম করিতে পারে না, কর্ণ আছে কিছুই শুনিতে পায় না,—তাহার পর সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, 'দাদু, পুত্তলিকার

চুল কাঁচা না পাকা?' বৃদ্ধের কমা ওয়াশীল বাকী সব গোলমাল হইয়া গেল, তিনি সুধার একটী কান ধরিয়া বলিলেন, 'পুত্তলিকা তোর বর রে শালী! এখন পড়, আমায় একটু কাজ করতে দে।'

সুধা কিল দেখাইয়া আবার পড়িতে লাগিল। কিন্তু যেই দেখিল তাহার মেনী বেরালটা একটা নিতান্ত ভালো মানুষের মত প্রকাণ্ড লৌহ সিন্দুকের তলদেশ হইতে গা ঝাড়া দিয়া বাহির হইল, অমনি তাহার পাঠ সাঙ্গ হইল। মেনীটি সুধারাণীর বড় আদরের। সে সযত্নে তাহাকে বুকের উপর তুলিয়া লইয়া দাদামহাশয়ের কাগজপত্রের নিকট ধুপ্ করিয়া ফেলিয়া দিল। এবার জমিদার মহাশয় বোধ হয় মনে-মনে একটু রাগিলেন। তখন তিনি বলিলেন, 'যাও ত মিশ্র মহাশয়, দিদিকে বাড়ীর ভিতর দিয়ে এসো।' এই কথা শুনিয়া সুধারাণীর বড় অভিমান হইল। সে অভিমানের স্বরে বলিল, 'কেন গা আমি কি একলা পথ চিনিনি? বেশ, বেশ, আমি নিজেই যাচ্চি।' বলিয়াই, সে ছুটিয়া চলিয়া যাইতেছিল। তাহার ন্যায়সঙ্গত ক্রোধে জমিদার মহাশয়ের নিজেরই লজ্জা হইল। সঙ্গে সঙ্গে সুধারাণী যে পিতৃমাতৃহীনা, তাহা মনে পড়িল। অমনি তিনি পলায়মানা দৌহিত্রীর

শ্লথ অঞ্চলপ্রান্ত নিজ বজ্রমুষ্টির মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, 'না, বোন্, তোকে যেতে হবে না। তুই আমার কাছে না বসলে কি আমার কাজ হয়? লক্ষ্মী-রাণী, ঠাট্টাও বুঝিস্ না?' বিড়াল মহাশয়া এই সবেগ অধঃপতনে সভয়ে ছুটিয়া পলাইল, আর তার অধিকারিণী মহাশয়া এই মানভঞ্জনে অতি মাত্রায় আনন্দিত হইয়া আবার 'পুত্তলিকার' স্বভাব ও প্রকৃতি অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইল।

এমন সময়ে দ্বারপ্রান্তে হিরু আসিয়া জমিদার মহাশয়কে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ এই আগন্তুক কিশোরটীকে দেখিয়া সুধারাণী তাহার মুখের দিকে বিস্মিত নয়নে চাহিয়া রহিল। যতুনাথও তাহাকে হঠাৎ চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি দরকার তোমার?'

হি।—আমার কোনই দরকার নেই, আপনি কি দরকারে আমায় ডাকৃতে পাঠিয়েছিলেন, তাই জানতে এসেছি

মিশ্র মহাশয় ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ এই কিশোরবয়স্ক বালকের অপূর্ব্ব তেজস্বিতা দেখিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। এই কুড়ি পঁচিশটা গ্রামের মধ্যে কেহই জমী-

দার মহাশয়ের নিকট মুখ তুলিয়া কথা কহিতে সাহস পায় না, ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া সকলেই হুকুম শুনিবার জন্য অধোমুখে দাঁড়াইয়া থাকে, আর সামান্য এই বালক কোন্ সাহসে সদম্ভে এতগুলা কথা এক নিঃশ্বাসে বলিয়া গেল? যদুবাবুও ব্যাপারটা বেশ পরিষ্কার বুঝিতে পারিলেন না। তখন ধনঞ্জয়ের পিতা নবগোপাল বোস আসিয়া বলিল, 'কর্ত্তাবাবু, এটী হচ্ছে—ওর নাম গে—হেম ভট্চায্যির ছেলে। এ—ওর নাম কি—ধনঞ্জয়কে রাস্তায় একা পেয়ে—কি বলে—যৎপরোনাস্তি প্রহার করেছে। কালই কর্ত্তার কাছে আমি—ওর নাম গে—আরজি করেছিলুম। কর্ত্তামহাশয় নিজেই—কি বলে—এই হিরুকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছিলেন।'

যদুবাবু এতগুলি 'ওর নাম গে'—র সোপান অতিক্রম করিয়া আসিয়া এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝিতে পারিলেন। তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'ওঃ! তোমারই নাম হিরু! আমি এতক্ষণ বুঝতে পারিনি। বসো, বসো।'

হিরুর অঙ্গে একখানি শুভ্র উত্তরীয়, আর পরিধানে একখানি মোটা অথচ পরিষ্কার ধুতি। তাহার নগ্নপদ, শুভ্র উপবীত গুচ্ছ দক্ষিণ পার্শ্বে প্রকাশিত, আর তরুণ

সুন্দর চক্ষে সেই অকপট স্নিগ্ধ হাসি। চঞ্চলা লক্ষ্মীও সে সুগভীর দৃষ্টির অন্তরালে আপনার চঞ্চলতা হারাইয়া ফেলিল। কাছারীর সকলেই কলম ছাড়িয়া এই মকদ্দমা শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল।

হিরু কোনও দিকে চাহিল না, শুধু যদুনাথের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, 'আজ্ঞে, সকালবেলা আমার নিজের কাজকর্ম্ম আছে, এখন ত আমার বসবার সময় নেই।'

যদুনাথ চশমাটা নাসিকামূলে সরাইয়া তাহার উপরের ফাঁক দিয়া হিরুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'কাল তুমি যে একজন নির্দ্দোষ লোককে এমন নির্দ্দয়ভাবে মেরেছ, তার সম্বন্ধে তোমার কি কৈফিয়ৎ আছে?'

হি।—আপনি যে ভাবে প্রশ্নটা করলেন, তার উত্তর দিতে গেলে নিশ্চয়ই আমি দোষী।

যা।- তবে কি তুমি ধনা বোসকে মারোনি বলতে চাও?

হি।—হাঁ, মেরেছি. কিন্তু কি অবস্থায় ও কেন মেরেছি, তা বোধ হয় আপনি শোনেন নি।

যা।—আচ্ছা, বল, না হয় তোমারই মুখ থেকে একবার শুনি।

হিরণ্ময় এক নিঃশ্বাসে প্রকৃত ঘটনাটী বলিয়া গেল।

বৃদ্ধ নবগোপাল সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। কিন্তু তবুও মান বাঁচাইবার জন্য বলিল, 'ওর নাম কি—হেম ভট্চাযিযর ছেলে—এত মিথ্যা কইতে শিখেছে—ঝি বলে—তা আমি জানতুম না।'

মিথ্যার নাম শুনিয়া হিরণ্ময়ের সেই প্রশান্ত চক্ষু অগ্নি-গোলকের মত সহসা জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল, 'কি, আমাকে বাবার নাম করিয়া অপমান! আমি আপনাদের কোনও কথা শুনতে চাই না। আমার যা পারেন, তাই করবেন। এই মিথ্যার দরবারে আমার স্থান নেই।' বলিয়া সে উত্তরীয় স্কন্ধে ফেলিয়া সদর্পে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে চলিয়া গেল।

বৃদ্ধ যদুনাথের চশমা খুলিয়া গেল, নবগোপাল আমতা-আমতা করিতে লাগিল, বালিকা সুধা স্বপ্নাহতের মত 'বোধোদয়'-হস্তে হিরণ্ময়ের প্রস্থানের পথের দিকে চাহিয়া রহিল।



এই ঘটনার পর ছয়মাস কাটিয়া গিয়াছে।

হিরণ্ময় প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে, কিন্তু মোক্ষদা তাহাকে লেখাপড়া শিখাইবার

জন্য কলিকাতায় পাঠাইতে চাহিলেন না। ইতিমধ্যে সে স্থানীয় টোল হইতে শিক্ষালাভ করিয়া 'বিদ্যাতীর্থ' উপাধি পাইয়াছে। গ্রামে হিরণ্ময়ের সুখ্যাতি ও চরিত্রের দৃঢ়তা দেখিয়া সকলেই তাহার গুণানুরাগী হইয়া পড়িয়াছে। কেবল নবগোপাল ও ধনঞ্জয় সেই অতীত অপমানের জ্বালা ভুলিতে পারে নাই।

শ্রাবণের একটী ধারাধৌত প্রভাতে যদুনাথের প্রকাণ্ড গাড়ী হিরুদের বাড়ীর সঙ্কীর্ণ গলিপথে আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ী হইতে অবরোহণ করিয়া যদুনাথ হিরুর চালার নিকট আসিয়া ডাকিলেন—'হিরু' বাড়ী আছ?

হিরু তখন কতকগুলি বালককে ঘরের দাওয়ায় বসাইয়া পাঠ শিক্ষা দিতেছিল। সে বাহিরে আসিয়া গ্রামের জমীদারকে তাহার দ্বারস্থ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। 'এ কি আপনি আমাদের বাড়ী?'—ইত্যাদি বলিয়া সাদরে তাঁহাকে বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল। জমীদারের যোগ্য আসন তাহার ঘরে নাই, তাই একখানি গলিত-প্রায় কুশাসনে তাঁহাকে বসিতে দিল।

যদুনাথ বলিলেন, 'বাবাজী, আমার সঙ্গে তোমার লৌকিকতা করতে হবে না, তোমার বাবা আমাদের

কুলপুরোহিত ছিলেন। তোমায় একটা কথা বলতে এসেছিলাম।'

'কি বলুন?'

'মনে করেছি, আমার নাতিনীটিকে একটু সংস্কৃত শেখাবো। তা, বাবাজী, তুমি যদি সে ভারটী নাও, ত বড় সুখী হই। অবশ্য তোমার পূজনীয়া মাতা-ঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করে তবে এ বিষয়ে আমায় মত দেবে। কিন্তু আজই আমার উত্তর পাওয়া চাই। এ জন্য তোমায় অবশ্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেবো।'

হিরণ্ময় হাস্যমুখে উত্তর দিল, 'এরই জন্য আপনি বুড়ামানুষ এই বর্ষা মাথায় করে গরীবের বাড়ী এসেছেন! একটু যদি অপেক্ষা করেন, ত মাকে—জিজ্ঞাসা করে' এখনই এর উত্তর দিই।

যদুনাথ বলিলেন, 'বেশ, বাবা।'

হিরণ্ময় ছুটিয়া রান্নাঘরে মাতার নিকট গেল। মোক্ষদা আড়াল হইতে সব শুনিয়াছিলেন। তাঁহার মন তখন এ জগৎ ছাড়িয়া অন্য জগতে কিসের সন্ধানে ফিরিতেছিল। হিরুকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন, 'হাঁ, বাবা, জমীদার মহাশয়ের প্রস্তাবে তুমি রাজী হও গে।' জননীর মুখে এই অপ্রত্যাশিত উত্তর পাইয়া হিরণ্ময়

কিছুক্ষণের জন্য মুগ্ধ হইয়া রহিল। জননী বলিলেন, 'তুমি বল যে, বিদ্যা দান পারিশ্রমিক নিয়ে করতে নেই।—বিনা পয়সায় যদি লক্ষ্মীকে পড়াতে বলেন ত রাজী হও গে।'

জমীদার মহাশয় মুগ্ধচক্ষে এই ক্ষুদ্র পরিবারটির বিমল শান্তি ও নিরাবিল আত্মতৃপ্তির কথা ভাবিতেছিলেন। প্রভাতের বর্ষাবাতাসে একটা শীতশিহরণ জাগিয়া উঠিতেছে, পৃথিবী হইতে আনন্দ যেন চিরতরে বিদায় লইয়াছে। বর্ষা যে জগতের বুকভাঙ্গা অশ্রুপ্লাবন। সেই অনন্ত অশ্রুপ্লাবনের ভিতর এই হাস্যপূর্ণ, শান্তিময়, তৃপ্তিময় দুইটী প্রাণী কোন্ গুণে এই স্যাঁতসেঁতে বাড়ীটার ভিতর একটা আনন্দলোক নির্ম্মাণ করিতে পারিয়াছে? লক্ষ লক্ষ টাকার অধীশ্বর হইয়াও উত্তরাধিকারীশূন্য বৃদ্ধ যদুনাথ কোন্ পাপে প্রাণে একটুও শান্তি পাইলেন না? তাঁহার দুইটী প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র ছিল, তাঁহার কন্যা ও জামাতা ছিল, সংসার আত্মীয় কুটুম্বে পূর্ণ ছিল,—কার অভিশাপে সে পারিবারিক সুখ আজ আকাশকুসুম হইয়া গেল? এই সব দুশ্চিন্তার ঘূর্ণীপাকে পড়িয়া যদুনাথ হাবুডুবু খাইতেছিলেন, এমন সময় হিরু আসিয়া ধীরভাবে কহিল, 'আপনার প্রস্তাবে মা মত করেছেন, কিন্তু আমায়

মাহিনা দিতে পারবেন না।' যদুনাথ 'হো-হো' করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, 'আচ্ছা তাই হবে, কিন্তু কাল সকালে আমাদের বাড়ী যেও, বাবা।'

হি:—আজ্ঞে হাঁ, নিশ্চয়ই যাবো। কিন্তু আজ আপনি নিজে আমার বাড়ীতে এসে কেবল আমায় লজ্জা দিলেন, আপনার যোগ্য আসন আমি দিতে পারলুম না।'

যদুনাথ হাসিয়া বলিলেন, 'বাবাজী, তুমি আমার পুত্রতুল্য। বাপ কি সন্তানের কাছে সম্মানের আসন চায়?' বলিতে বলিতে তিনি বাটীর বাহির হইয়া গেলেন।

গ্রামের ছোট বড়—সব ছেলেরাই হিরুর ভক্ত শিষ্য। পড়া বলিয়া দিবার ভার হিরুর উপর, অভাব ও অভিযোগের ব্যবস্থা তারই উপরে, আপদে-বিপদে হিরুদাদা ছাড়া তাহাদের আর গত্যন্তর নাই। সংপ্রতি হিরু গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য একটী অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। কিন্তু তার জননী বলিতেছেন যে, সে স্থানীয় ইংরাজী বিদ্যালয়ে মাষ্টারী করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষাগুলিতে উত্তীর্ণ হউক। কারণ, একালে যত বড়ই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হউক না কেন, ইংরাজীতে কৃতবিদ্য

না হইলে কোথাও আদর নাই। তাই হিরু একটা বিষম গোলযোগে পড়িয়াছে। এদিকে জমীদার মহাশয় তাহার স্কন্ধে আবার এক বিষম বোঝা চাপাইয়া গেলেন, তাহা অবশ্য মোক্ষদারই প্ররোচনা বলিতে হইবে। জমীদার-বাড়ীতে মান বাঁচাইয়া কাজ করিয়া আসা—সে এক বিষম সমস্যার কথা। হিরু কি তাহা পারিবে? হয় ত কোনও দিন কোন নূতন বিপদ উপস্থিত হইলে, সে ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া একটা কাণ্ড বাধাইয়া বসিবে। কিন্তু এখন সম্মতি দিয়া সে পথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করা অসম্ভব। আবার এদিকে কালক্ষয় করিলে স্কুলের মাষ্টারীটিও হাতছাড়া হইয়া যায়। তাই সে সেদিন সকালে ছেলের দলকে বিদায় দিয়া খোড়ো ঘরের ভিতর বসিয়া মেঘবিলুপ্ত শূন্য গগনের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল। সে তাহার জীবনের গতি ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহার সবই আছে—পিতৃহীন হইলেও সে পিতার অভাব একদিনও বুঝিতে পারে নাই। তবে আজ তাহার সদানন্দ মুখে হঠাৎ বিষাদের কালো ছায়া নামিয়া আসিল কেন? যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের পয়সার অভাব নাই, সামান্য বিধবার পুত্র হইয়া প্রলোভনের বশে অর্থের মোহে আত্মহারা হইয়া পড়িবে না ত?

পরদিন সকালে সে উত্তরীয়খানি লইয়া নগ্নপদে জমীদার-ভবনে গিয়া উপস্থিত হইল। অন্দরমহলের সম্মুখেই একটী ঘর সুধারাণীর অধ্যয়ন-স্থানের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে। যদুনাথ নূতন শিক্ষক মহাশয়ের কাছে সুধারাণীকে পরিচিত করিয়া দিলেন। হাস্যময়ী, চঞ্চলা লক্ষ্মী সহসা গম্ভীর হইয়া পড়িল। হিরুর প্রথমে বড় লজ্জা করিতে লাগিল। নহিলে সে অমন করিয়া উত্তরীয়প্রান্তটী তর্জ্জনীমূলে জড়াইতে লাগিল কেন? কিছুক্ষণ 'বোধোদয়' ও 'শুভঙ্করী'র পাতাগুলি উল্‌টাইয়া হিরু বলিল, 'খুকী, তুমি কি পড়বে?'

সুধারাণী তেমনি অবনতমুখে বলিল, 'আমার নাম কি 'খুকী'? আপনি ত বেশ মাষ্টার মশাই, আমায় কি খুকীর মত দেখচেন?'

বালিকার এই সরল সুন্দর প্রশ্নটী শুনিয়া হিরণ্ময়ের বড় হাসি পাইল। কিন্তু সে বড় আত্মসংযমী, সহসা নিজের ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলে না। সে জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা, তবে কি বলে ডাকবো?'

সপ্রতিভ সুধা উত্তর দিল, 'আমি আপনার যা হই, তা-ই বলে ডাকবেন।'

'আচ্ছা, তোমায় লক্ষ্মী বলেই ডাকবো।'

'ভালো জ্বালা! আমার নাম কি লক্ষ্মী? আমার নাম শ্রীমতী সুধারাণী।'

'আচ্ছা, সুধারাণী বলে ডাকবো।'

তরুণ হিরণ্ময় তন্ময় হইয়া এই স্বর্গের কুসুমটী দেখিতেছিল। বালিকা'র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কোথাও একটুও ত্রুটী নাই। ঠিক মর্ম্মর-খোদিত একটী ক্ষুদ্র নারী-মূর্ত্তি। তাহার নাসিকার নোলকটী সূর্য্যকিরণোজ্জ্বল একবিন্দু শিশিরের মতই নিটোল ও ভাস্বর। হাসিলে তাহাকে বড়ই সুন্দর দেখায়। বালিকার শরীরে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ দেখিয়া তাহার কবি-বর্ণিত "সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা" মনে পড়িতেছিল। কিন্তু সে যে উদ্ভিন্ন যৌবনের চিত্র, আর এ যে শৈশবের সুকুমার সৌন্দর্য্য! হিরণ্ময় ভাবিল—কোনটী বেশী সুন্দর? এই কিশোর কোরকটীই বোধ হয় বেশী সুন্দর, নহিলে সে অমন করিয়া তার ছাত্রীর পানে মোহমুগ্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল কেন? সুধারাণীর বড় লজ্জা করিতে লাগিল। কিন্তু সে বড় চপলা। সহসা সে বলিল, 'আমার মুখের দিকে চেয়ে কি দেখচেন? পড়াবেন না?' তখন হিরণ্ময়ের যোগভঙ্গ হইল। সে কাগজ কলম লইয়া সুধাকে সংস্কৃত অক্ষরগুলির পরিচয় করাইতে বসিল। কিছুক্ষণ পরে তাহার

অপূর্ব্ব মেধাশক্তি দেখিয়া সে বিস্মিত হইয়া গেল। কোন অক্ষরই দুইবার বলিয়া দিতে হয় না। হিরণ্ময়ের মনে পড়িল সংস্কৃত কবির সেই উক্তি—'প্রভবতি শুচিবিম্বোদ্গ্রাহে মণি র্নমৃদাং চয়ঃ। হিরু বলিল, 'তোমার বিদ্যা অপূর্ব্ব—তোমার শক্তিও অপূর্ব্ব!' এই উক্তির সার্থকতা সে সরলা বালিকা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না।

প্রায় আড়াই ঘণ্টার মধ্যে সুধারাণী সব অক্ষরগুলি চিনিয়া লইল। তখন হিরণ্ময় বলিল, 'আজ আসি লক্ষ্মী, আবার কাল সকালে আসবো।'

লক্ষ্মী বলিল, 'আবার আমায় লক্ষ্মী বলে ডাকচেন? দিদিমা বলেছেন, মানুষের নাম 'লক্ষ্মী' রাখলে দেবতাদের অপমান হয়।'

হিরু বলিল, 'না লক্ষ্মী, আর তোমায় 'লক্ষ্মী' বলে ডাকবো না, এইবার তোমায় সত্যি 'সুধারাণী' বলে ডাকবো।'

পুস্তকের রাশি হাতে করিয়া বালিকা উঠিয়া দাঁড়াইল। বাহিরের উজ্জ্বল রৌদ্র বালিকার লুণ্ঠিত কেশের উপর আসিয়া পড়িল। হিরু ভাবিল—এ একটী সুন্দর প্রজাপতি,—ইন্দ্রের নন্দন কাননে পারিজাতকুঞ্জে সে উড়িয়া বেড়াইত, হঠাৎ পথভ্রান্ত হইয়া দুঃখময় ধরণীর অন্ধকারময়

ভবনে আসিয়া পড়িয়াছে। হিরুর মনটা কেমন হইয়া গেল—যদুবাবুর বাড়ী হইতে রাস্তায় পৌঁছিয়া যখন দেখিল অনেকখানি বেলা হইয়া গিয়াছে, তখন সে ভাল করিয়া বুঝিতেই পারিল না যে এতক্ষণ সে কিসের ধ্যানে এমন তন্ময় হইয়াছিল।

৪

হিরণ্ময় স্থানীয় ইংরাজী স্কুলের সেই মাষ্টারিটী গ্রহণ করিয়াছে। এখন আর তাহার এক মুহূর্ত্তও বিশ্রামের সময় নাই। যত দরিদ্র ও অক্ষম ছেলেরা হিরুর চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া তাহারই নিকট লেখাপড়া করে। সে একটী নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে। এজন্য জমীদার মহাশয় তাঁহার কাছারী বাড়ীর একটা প্রকাণ্ড হলঘর ছাড়িয়া দিয়াছেন। প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়াই সে পাড়ার সকলের বাড়ী গিয়া তাহাদের কুশলসংবাদ লইয়া আসে। ইহা মোক্ষদাসুন্দরীর শিক্ষার-ফল; কারণ তাঁহার স্বর্গীয় স্বামীও এইরূপ করিতেন। এই জন্যই সমগ্র পল্লীটিতে তাঁহাদের এত সমাদর, এত প্রতিপত্তি। যেখানেই বিপদ, সেইখানেই বিপদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অসমসাহসিক হিরণ্ময়। সেদিন লালমোহন পোদ্দারের ছোট মেয়ে বিন্দু

কোলেদের "বড়পুকুরে" ডুবিয়া গিয়াছিল্ ; হিরু তাহাকে বাঁচাইল। "বড়পুকুর" অতলস্পর্শী,—সেজন্য সেখানে কেহই এ পর্য্যন্ত অবগাহন করিতে ভরসা করে নাই। নিত্যানন্দ বৈরাগী পাড়ায় বৈষ্ণব গান গাহিয়া বেড়ায়, তাহার তিনকুলে আপনার বলিতে কেহই নাই। অথচ সকলেই তাহার সারল্যে ও ধার্ম্মিকতায় মুগ্ধ হইয়া তাহাকে ভালবাসিত। কিন্তু সেই নিত্যানন্দের যেদিন দারুণ বিসূচিকা হইল, যেদিন জগতের সকলেই অস্পৃশ্য বলিয়া তাহাকে গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার প্রস্তাব করিল, সেদিন মোক্ষদাসুন্দরী গম্ভীরমুখে আসিয়া হিরণ্ময়কে বলিলেন, 'হাঁ রে হিরু, তুই কি চিরকালই পড়াশুনা নিয়ে থাকবি? নিত্যানন্দের কলেরা হয়েছে বলে' যে তাকে পাড়াশুদ্ধ সব লোকে কুলোর বাতাস দিয়ে চৌধুরীদের জলায় রেখে আসচে, সে খবরটা আর বুঝি নিতে নেই? আর কাকেই বা বলি, কর্ত্তা বেঁচে থাকলে এমন অন্যায় তাঁর চোখের উপর কখনো হতে পারতো?'

হঠাৎ হিরুর সেই স্নিগ্ধশ্যাম সুন্দর চক্ষুদুটী উৎকণ্ঠায় ভরিয়া গেল। সে ব্যস্ত হইয়া বলিল, 'কি করবো, মা, আমায় বলে দাও।'

স্থিরকণ্ঠে মোক্ষদা বলিলেন, 'তা-ও কি বলে দিতে হবে হিরু ? তবে বেঁচে লাভ কি ?'

সেদিন হিরু আর এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করে নাই। ঘোষেদের বাহিরের প্রাঙ্গণে মলমূত্রলিপ্ত আসন্নমৃত্যু সেই রোগীকে সে নিজের স্কন্ধে সযত্নে বহিয়া বাড়ীতে লইয়া আসিয়াছিল। পনেরো দিন সে অক্লান্ত সেবা করিয়া নিত্যানন্দকে নীরোগ করিল। বৃদ্ধ নিত্যানন্দ আনন্দে উচ্ছ্বাসে হিরণ্ময়ের হাত দুইখানি ধরিয়া বলিয়া উঠিল, 'দাদাবাবু, তুমিই আমার প্রাণদাতা। তোমার জন্যই আমি এ যাত্রা বেঁচে গেলুম। কিন্তু আমার মত লোককে কেন বাঁচালে দাদাবাবু ? আমার যে পরপারের বাঁশী বেজেছিল, কেন আমায় যেতে দিলে না ?'

এই কথা বলিতে বলিতে নিত্যানন্দের দুই চোখ দিয়া অবিরাম ধারা বহিতে লাগিল। স্তব্ধ হিরণ্ময় তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বাটীর বাহির হইয়া গেল।

গত কয়েকদিন অনবসরবশতঃ হিরু সুধাকে পড়াইতে যাইতে পারে নাই। আজ জমীদার-গৃহে প্রবেশ করিতেই নবগোপাল বসুর সঙ্গে তাহার দেখা হইল। তাহার মস্তকটী কদমফুল করিয়া ছাঁটা, কপালে রক্তবর্ণের ত্রিপুণ্ড্র, গলায় হরিনামের রুদ্রাক্ষমালা। সে যেন সাত্ত্বিকতার

অবতার। নবগোপাল হিরণ্ময়কে সম্মুখে দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া জড়িতকণ্ঠে বলিল, 'কেমন ঠাকুরমশাই, ক'দিন এধারে আসেন নি যে? ওর নাম কি—মরুক গে—রাজাবাবু বলছিলেন যে অমন ইচ্ছামত পড়াতে আসতে হবে না। ওর চেয়ে—কি বলে—মাষ্টার রেখে মাহিনে দিয়ে পড়ানোই ভাল।'

'বেশ, তাঁকে তাই করতে বলবেন। তিনি যখন ব্যবস্থা ঠিকই করে ফেলেচেন, তাহলে আর আমার দরকার কি!'

এই বলিয়া হিরণ্ময় জমীদার-বাড়ী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু দেখিল অদূরে প্রাঙ্গণের মধ্যে সুধা-রাণী তাহার আদরের বিড়ালটী লইয়া খেলা করিতেছে। তাহার পরিধানে কেবল একখানি লালপাড় শাড়ী, পরি-স্নাত কেশগুচ্ছ তাহার পৃষ্ঠদেশ অন্ধকার করিয়া ছাইয়া পড়িয়াছে। হিরুর ইচ্ছা হইল, একবার তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া যায়। সে বালিকা—তাহার দোষ কি! সে তাহাকে 'পণ্ডিত মশাই' বলিয়া ডাকিত, সেই আদরের স্বরটী এখনও তাঁর মনে পড়িতেছে। পক্ষাহের পরিচয়েই এই বালিকাটী হিরণ্ময়ের অন্তরদেশের সকল পরিচয় লইয়াছে। সে মাতৃহারা, কিন্তু বড় অভিমানিনী। সামান্য

বালিকা হইলে কি হয়, তাহার অপূর্ব্ব ধীশক্তি ও দৃঢ়চিত্তভা দেখিয়া হিরণ্ময় আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। আর ত সে তাহাকে পড়াইতে আসিবে না, তবে একবার দেখা করিয়া গেলে ক্ষতি কি ?

কিন্তু তাহাকে আর যাইতে হইল না। অদূরে তাহাকে দেখিয়া বালিকা নিজেই ছুটিয়া আসিল।

'পণ্ডিত মশাই, আপনি আর আমায় পড়াতে আসেন না কেন ?'

বিরসবদনে হিরু উত্তর দিল 'আর আসবো না সুধা, আজ থেকে আমার ছুটি।'

দৌড়িয়া আসিয়া বালিকা হিরুর হাত ধরিল। তাহার নাতিসিক্ত চুলের গোছা হিরুর বাহুমূলে গিয়া পড়িল। হিরুর অন্তরতল শিহরিয়া উঠিল। সুধা অভিমানের সুরে বলিল, 'না পণ্ডিতমশাই, তা হবে না। আপনাকে আসতেই হবে। নহিলে আমি দাদামশাইকে বলে দোবো।'

'তোমার দাদামহাশয় বলেছেন যে অমন ইচ্ছামত পড়াতে এলে চলবে না। কাল থেকে তোমার নূতন মাষ্টার আসবে—তাঁর কাছেই এবার থেকে পড়বে।'

সুধা হিরুর হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। 'না, আমি অন্য মাষ্টারের কাছে পড়ব না ত। আমি আপনার কাছেই

সংস্কৃত পড়বো। আপনি শীঘ্র আসুন। নইলে আমি এখুনি দাদামহাশয়ের কাছে গিয়ে বলে দোবো।'

হিরু মহাবিপদে পড়িল। সে ভিতরে যাইতে বাধ্য হইল। সেদিন রাজাবাবু স্বয়ং আসিয়া বলিয়া গেলেন যে, তিনি অন্য মাষ্টার রাখিবার কল্পনাও করেন নাই, হিরুই সুধারাণীকে পড়াইবে।

নবগোপালের ব্যবহারে হিরু আশ্চর্য্য হইয়া রহিল।

৫

নয়ানপুর গ্রামের অনতিদূরে একটী বাগানে একজন নব-প্রসূতি শিশু পুত্র বক্ষে লইয়া কাঁপিতেছিল।

দূরবিসর্পী গ্রাম্যপথ বনজ কুসুমের মধুগন্ধে ভরিয়া গিয়াছে। তখনও সমস্ত পাড়ার ঘুম ভাঙ্গে নাই। কিন্তু বিহঙ্গদলের কলকূজনে চারিদিকে একটা অপূর্ব্ব জাগরণ সূচিত হইতেছিল। পূর্ব্বোক্ত বাগানের ভিতর দিয়া একটী সঙ্কীর্ণ পথ পাকা রাস্তায় গিয়া পড়িয়াছে। তাহার অবস্থা দেখিলেই বোঝা যায় যে, সেটী সাধারণের চলিবার রাস্তা। ঘুরিয়া গেলে বিলম্ব হয় বলিয়া পথিকেরা পতিত বাগানের উপর দিয়া এই সুগম্য রাস্তাটী করিয়া লইয়াছে। বাগানের ভিতর ঘন আমগাছের সার। সেই আমগাছের

তলায় একখানি শতছিন্ন বসন বিস্তৃত করিয়া প্রসূতি ঘুমভাঙ্গা চোখে পাণ্ডুর বদনে বসিয়া কাঁদিতেছে।

প্রসূতি স্ফুটাঙ্গী, স্বাস্থ্যময়ী, তরুণী। দেখিলেই মনে হয়, নবজাত শিশুটী তার প্রথম সন্তান। প্রসূতির অঙ্গে স্বল্প বসন, বক্ষোলগ্ন শিশুটীও বিবস্ত্র। তরুণী বিধবা, তাহার মুখের অপূর্ব্ব লাবণ্য প্রভাতের সদ্যোবিকচ কমলের ন্যায় প্রস্ফুট। সেই অপূর্ব্ব লাবণ্যের উপর একটা বিষণ্ণ পরিম্লান ভাব—তাহা বড় সুন্দর। তরুণী জানিত না যে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সেই সঙ্কীর্ণ বনপথটী জনসঙ্কুল হইয়া উঠিবে। ক্রমে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে বিশেষ সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িল। একটা অজ্ঞাত ভয়, অপরিসীম লজ্জা তাহার সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, সহসা সে আমগাছের পশ্চাতে আত্মগোপন করিতে চেষ্টা করিল।

ঐ না কে বনপথের শুষ্কপত্র পদদলিত করিয়া নিকটে আসিতেছে? হাঁ, ঐ ত একটী পুরুষ, নগ্নপদ, প্রশান্ত দেহ, তরুণ, উজ্জ্বলদেহ, স্কন্ধে একখানি শুভ্র উত্তরীয়, ও কি দেবদূত? রমণী ভাবিল—বোধ হয় দেবদূত। তাই আর সে আত্মগোপন করিতে পারিল না। দেবদূতের নিকট মানুষে কি আত্মগোপন করিতে পারে? সে ভাবিল—স্বামীর কাছে যেমন নিভৃতে স্ত্রীর লজ্জা করিতে নাই,

তেমনি দেবতার কাছে মানুষেরও লজ্জা করিতে নাই। স্বামী!—সেই কথাটা মনে পড়িতেই রমণী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার রুদ্ধকণ্ঠের সেই উচ্ছ্বসিত শব্দ দূর হইতে বেশ স্পষ্ট শোনা গেল।

আগন্তুক পুরুষ সেই আম্রবৃক্ষের তলে ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া দাঁড়াইল। আবার অগ্রসর হইল, আবার শব্দ শুনিয়া পশ্চাতে ফিরিয়া সেই হতভাগিনীকে দেখিতে পাইল। তখন ফিরিয়া আসিয়া রমণীকে স্নেহকোমলস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কে এখানে?'

রমণী এবার কাঁদিয়া ফেলিল। 'আমি বড় অভাগিনী গো, আমার কেউ নেই।'

পুরুষটী ব্যস্তভাবে নিকটে আসিয়া বলিল, 'সে কি, কেউ নাই কি? কেউ নাই যদি, তবে ভগবান আমায় পথ থেকে ফেরালেন কেন?'

রমণী শিশুটীকে দুই হাতের নিবিড় বেষ্টনে বক্ষোবসনে আবৃত করিয়া শুধু অসহায়ভাবে কাঁদিতে লাগিল।

পুরুষ হিরণ্ময়—সুধাকে পড়াইতে যাইতেছিল।

'আসুন, ছেলেকে আমার কোলে দিন। উঠুন দেখি, আস্তে আস্তে। ছি! একলাটী এই বনের ভিতর এমনি করে বসে থাকে কি মানুষে!'

রমণী দাঁড়াইয়া স্থিরকণ্ঠে বলিল, 'আমায় নিয়ে তুমি কোথায় যাবে গা ? আমায় যে সবাই ত্যাগ করেছে—সমাজে যে আমার স্থান নেই। আমি যে বড় হতভাগিনী। ভগবান যে লোকালয়ে আর আমার মুখ দেখাবার উপায় রাখেন নি !'

হিরণ্ময় মৃদু হাসিয়া বলিল, 'আমি যতক্ষণ সশরীরে বেঁচে আছি, ততক্ষণ আপনার কোনও ভয় নেই। আমার সঙ্গে আসুন। ভাগ্যে আমি ফিরে এসেছিলুম।'

দুইজনে নীরবে বনপথ অতিক্রম করিয়া একটী পাকা রাস্তায় পড়িল। তখন পথে লোকজন যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য্য একখানি লালপাছা শাড়ী পরিয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলেন। তিনি গ্রামে পৌরোহিত্য করেন। সকলে তাঁহাকে সাত্ত্বিক পুরুষ বলিয়া বিশেষ শ্রদ্ধা করে। হিরণ্ময়ের পিতার সঙ্গে মৌখিক বন্ধুত্ব থাকিলেও, তিনি মনে মনে তাঁহার শত্রু ছিলেন। হিরণ্ময়ের ক্রোড়ে শিশুপুত্র ও পশ্চাতে একটী গুণ্ঠনবতী নারী দেখিয়া তিনি সূর্য্যস্তব বন্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এটী কে হিরু ভায়া ? এত সকালে কোথা থেকে ?'

হিরণ্ময় বলিল, ‘এটী আমার কুড়ানো ভাই, আর এটী আমার কুড়ানো বোন। প্রণাম, দাদামশাই।’

ক্রমে হিরু বাড়ীর দ্বারে পৌছিল। তাহার গম্ভীর ‘মা’-আহ্বানে মোক্ষদাসুন্দরী কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিলেন। এক দৃষ্টিতে সমস্ত ব্যাপারটী বুঝিয়া হিরণ্ময়কে বলিলেন, ‘হাঁ, একেই ত বলে বাপের বেটা। কিন্তু এখন মেয়ের বন্দোবস্ত করে দে। আমার হাতে এখন অনেক কাজ। এখুনি বেরিয়ে গেলে তোমার চলবে না, বাবা।’

হিরু ছেলেটীকে মোক্ষদার কোলে দিয়া তাড়াতাড়ি একটী সদ্য পরিষ্কৃত ঘটী লইয়া গোয়াল-ঘরে প্রবেশ করিল। দুগ্ধ দোহন করিয়া মাতার নিকট পাত্রটী প্রদান করিল। আসিয়া বুঝিল, ইতিমধ্যেই তাহার মাতা এই নবাগতার সঙ্গে বেশ ভাব করিয়া লইয়াছেন।

একটু বেলা হইলে পাড়ার অনেক পুরুষ ও নারী হিরণ্ময়দের বাড়ী বেড়াইতে আসিল। গাঙ্গুলিদের রাঙাদিদি জিজ্ঞাসা করেন, ‘হাঁ গা’ কে এসেছে, তোমাদের বাড়ী? ভট্চাযিমশাই সকালে বলছিলেন।’ মিত্রদের বড়বৌ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘হিরু সকালে কাকে নিয়ে এল গা?’ পাড়ার সরকারী ঝি কাদি, ওরফে কাদম্বিনী, ছুটিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল, ‘কাদের মেয়ে

তোমাদের বাড়ী এল গা ?' এই সব প্রশ্নের বিপুল আবর্ত্তনে পড়িয়া মোক্ষদাসুন্দরীর প্রাত্যহিক কার্য্য সমাধা করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। তিনি শুধু সকলকেই বলিলেন, 'ও একটী গরীবদের মেয়ে, কেউ নেই। বড় অসহায় বলে আমাদের বাড়ী এনে রেখেছি।'

মেয়েটী তখন দাওয়ায় বসিয়া শিশুপুত্রটী কোলে লইয়াছিল। 'আহা, বেশ মেয়েটী! তা বাছা, কত দিন হলো তোমার কপাল পুড়েছে ?'

রমণী কোনও উত্তর দিল না। ভূমি-সংসক্ত-দৃষ্টি হইয়া ছেলেটীকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিল।

তখন গাঙ্গুলিদের রাঙাদিদি মুখ ঘুরাইয়া থুৎকার ত্যাগ করিতে করিতে স্পষ্টস্বরে বলিয়া গেলেন, 'উঃ! মাগীর কি দেমাক! আমরা যেন কেউ কিচ্ছু জানিনি! তুমি না বিষ্ণু কামারের ছোট বউ ?'

তিনি চলিয়া গেলেন। রমণীর মুখের উপর একটা কালো মেঘের ছায়া ঘনাইয়া আসিল।

৬

পাড়ায় মহা গোলমাল পড়িয়া গিয়াছে।

ঘটনাটা সংক্ষেপে এই। বিষ্ণু কামার পাড়ার একজন বেশ সঙ্গতিপন্ন ধনী। লোহার ব্যবসা করিয়া সে প্রকাণ্ড অট্টালিকা, দেউড়ীতে দরোয়ান, দুইখানা জুড়ী গাড়ী করিয়াছিল, কিন্তু তাহার একটী পুত্রও মানুষ হয় নাই। বড় ছেলেটী মৃত, মেজোটী গুলিখোর, আর ছোট ছেলেটী যাত্রার দলে ভুক্ত হইয়া সংপ্রতি নিরুদ্দেশ। বড় ছেলেটী বিবাহের পূর্ব্বেই দেশত্যাগ করিয়াছিল। মেজো ছেলের বউ বিন্দী বিপত্নীক শ্বশুরের সেবাশুশ্রূষা করে, কিন্তু সে বড় মুখরা। আর ছোট ছেলের স্ত্রী শিউলি স্বামীর জন্য কাঁদিত ও মেজো জায়ের গঞ্জনা ভোগ করিত। বহুদিন ধরিয়া ধনঞ্জয় বিষ্ণু কামারের নিকট ঋণের প্রয়োজনে যাতায়াত করিত। সে অধঃপতিত যুবক, কিন্তু তার রূপ আছে। সে কিছু ইংরাজী লেখাপড়াও শিখিয়াছিল। সে ক্রমে শিউলির সঙ্গে আলাপ জমাইয়া ফেলিল। বুভুক্ষিত মনের কাছে সকল খাদ্যই স্বাস্থ্যকর বলিয়া মনে হয়। তাই স্বামী-পরিত্যক্তা শিউলির মজিতে বড় দেরী

হইল না। সে কুলের বাহির হইয়া গেল। কিন্তু এত বড় ব্যাপারটা বিষ্ণু কামারের নিকটস্থ প্রতিবেশী ও আত্মীয়-অন্তরঙ্গ ছাড়া আর কেহ জানিতে পারে নাই। শিউলি শ্বশুরগৃহে অনেক অত্যাচার সহিয়াছিল। মানুষ অত্যাচারে যখন জর্জ্জরীভূত হইয়া পড়ে, তখন পাপের সান্ত্বনাও ভাল লাগে। তাই শিউলি যখন দেখিল, ধনঞ্জয় তাহারি জন্য পাগল—একটীবার শুধু দেখা পাইবার জন্য দ্বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বৈঠকখানায় বসিয়া থাকে—তখন তার মন টলিল। ছয়মাসমাত্র সে স্বামীর সহিত ঘর করিতে পাইয়াছিল, সে-ও অনেক দিনের কথা। ধনঞ্জয় বলিল, 'শিউলি, কেন এত কষ্ট সহ্য করো? আমার সঙ্গে চলো, আমি তোমায় রাজরাণী করে রেখে দোবো।' কথাটা অপ্রকৃত হইলেও, শিউলি এই মধুর প্রলোভনের করাল আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই।

ভদ্র গৃহস্থের বাড়ীতে এই ব্যভিচার আশ্রয় করিয়াছে দেখিয়া, হিরুর প্রতিবেশীরা তাহার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল। 'কি! হেম ভট্‌চায্যির ছেলের এত বড় বুকের পাটা! কুলাচার, দেশাচার—সব অধঃপাতে গেল! একটা বেশ্যাকে গৃহস্থের বাড়ী স্থান দিয়ে হিরু কি সমস্ত পাড়াটা উৎসন্নে দেবে?' কথাটা ক্রমশঃ মোক্ষদাসুন্দরীর কর্ণে গেল।

মাতা ডাকিলেন, 'হিরু!'

'মা!'

'পাড়ায় সব কি বলছে শুনিছিস ত?'

'সব শুনিছি মা। তোমার কি মত?'

'তিনি বেঁচে থাকলে আজ কি করতেন জানিস্? তিনি পাড়ার মতামতে ভয় পেতেন না। তিনি সারা-জীবন একলা আঁধারের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। পুরাণে দধীচীর কথা শুনিছিস ত—তিনি সেই দধীচীর মত ছিলেন; নিজের বুকের হাড় দিয়ে পরকে বাঁচিয়েছেন।'

'আমার কি সে ক্ষমতা হবে, মা? এ যে দারুণ বোঝা ঘাড় পেতে নিয়েছি মা। এ ভার বহিবার শক্তি কি আমার হবে? বিষ্ণু কামারের বউ কলকাতার মেয়ে, সে প্রলোভনে পড়ে এই অধঃপাতের রাস্তায় নেমে গেছে বলে সমাজে তার স্থান নেই। যে তাকে আশ্রয় দেবে, সমাজ তাকেও আশ্রয়চ্যুত করবে। জীবনের প্রথমেই যে বড় সমস্যায় পড়ে গেছি, মা। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। সকলের শ্রদ্ধা-ভালবাসা হারাবো, স্কুলেও কাজ করতে পাবো না, সুধাকেও পড়াতে পারবো না। সকলের পরিত্যক্ত হয়ে থাকতে হবে।'

'হিরু, এরই মধ্যে এত ভয় পেয়ে গেছিস? জীবনের

যে এখনও সবটাই বাকী। শিবকে যে সকলে ত্যাগ করেছিল—তিনি দেবাদিদেব হয়েও যে দেবতাদের সমাজে ঠাঁই পান নি। দোষ কি তাঁর—না, তিনি ভিখারীদের দেবতা—যারা আশ্রয়-হীন, অবোধ, ঘরছাড়া, কুৎসিত—তাদের সকলকেই তিনি আদর করে বুকের মাঝে আশ্রয় দিয়েছিলেন। সকলে তাঁহাকে অবহেলা করলেও সমুদ্র-মন্থনের সময় যখন হলাহল উঠে সৃষ্টিনাশ করতে যায়, তখন সে বিষের জ্বালা কাটাবার জন্যে দেবতারা কার পায়ে লুটিয়ে পড়েছিল জানিস ত ?'

হিরু অবনত বদনে বসিয়া রহিল। পার্শ্বের ঘর হইতে শিউলির ছেলেটার ক্রন্দনধ্বনি শোনা গেল। সন্ধ্যার আঁধারে হিরণ্ময়ের প্রশান্ত মুখমণ্ডল দেখা যাইতেছিল না, কিন্তু মাতার সে জলদর্চ্চিঃসুন্দর নির্ভীক ভাবটা বেশ ভাল করিয়াই দেখা যাইতেছিল। মোক্ষদাসুন্দরী গৃহকক্ষে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, 'দেখ হিরু, যে যা-ই বলুক, তুই আজ আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর যে, আমার মেয়ে শিউলিকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিতে পারবিনি ?'

হিরু নির্ব্বাক হইয়া রহিল। বাহিরের প্রস্ফুটিত গাঁদা-ফুলগুলি যেন অস্বাভাবিকরূপে ছোট হইয়া গেল। আকাশটা যেন আরও অনেক দূরে সরিয়া গেল। বহু

দুরের একটা ক্ষুদ্র তারকা যেন আরও উজ্জ্বলভাবে ভাস্বর হইয়া উঠিল। হিরু বলিল, 'হাঁ মা, আজ তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করলুম:—আমার একমুঠো জুটলে দিদিরও এক মুঠো জুটবে। দিদিকে কখনো ঘর থেকে তাড়াতে পারবো না।'

মোক্ষদাসুন্দরী চলিয়া গেলেন। পরদিন প্রভাতে যদুবাবুর বাড়ী গিয়া সে সুধার দেখা পাইল না। সে বাহিরে পড়িতে আসে নাই। শুনিল, যদুবাবু তাহাকে একবার ডাকিয়াছেন। সে তাঁহার কক্ষে যাইলে যদু-বাবু তাহাকে বসিতে বলিলেন।

'দেখ হিরণ্ময়, তুমি ছেলে মানুষ। তুমি তোমার বাড়ীতে একজন পতিতা নারীকে এনে সকলের কাছে নিজের মাথা হেঁট করেছ। তোমার স্বর্গীয় পিতাঠাকুরও এইরকম ছিলেন। তিনি যেটা ভাল বুঝতেন, সেটাকে প্রাণপণে আঁকড়ে থাকতেন—কারুর কথা শুনতেন না। তোমার এ কাজটা কতদূর গর্হিত হয়েছে, একবার ভেবে দেখ দেখি। তুমি শিক্ষকতার ব্রত নিয়েছ, কিন্তু এই কি সৎ নীতি? সমাজ যেটা মন্দ বলে দূরে ফেলে দিয়েছে, তুমি সেটা কি বলে গ্রহণ করলে? আমি এ কথা শুনে বড়ই মর্ম্মাহত হয়েছি। আজ থেকে লক্ষ্মীকে আর তোমার পড়াতে হবে না, স্কুলেও যেতে হবে না।'

হিরু কহিল, 'এ সব আমি আগেই জানতুম। তবে এটা জানতুম না যে, মানুষ হয়ে এমন নির্ম্মম হওয়া যায়। আপনি যে সব কথাগুলি বললেন, তার উত্তর দেবার স্পর্দ্ধা আমার নেই। শুধু এই কথাটী বলে বিদায় হই যে, আপনার একজন বড় কর্ম্মচারীর পুত্র যার এ দুর্দ্দশা করেছে, তাকে আমি সর্ব্বস্ব দিয়েও রক্ষা করবো।'

অদূরে নবগোপাল ক্রোধে ফুলিতেছিল। হিরু ধীরে ধীরে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

বহিঃপ্রাঙ্গণে সে দেখিল, সুধা খেলা করিতেছে। তাহার মুখে সেই সরলসুন্দর হাসি। হাসিল তাহাকে বড় সুন্দর দেখায়।

'পণ্ডিত মশাই, দাদামশাই বলেছেন যে, আপনি আর পড়াতে আসবেন না। আপনি না কি কি খারাপ কাজ করেছেন? আমার ত তা বিশ্বাস হয় না। কি করেছেন, পণ্ডিত মশাই?'

হিরু গম্ভীরকণ্ঠে উত্তর দিল, 'একটী গরীব মেয়েকে আমি বাড়ীতে এনে রেখেছি। তার কেউ নেই। সকলেই তাকে ত্যাগ করেছে। বুঝলে লক্ষ্মী? এই আমার খারাপ কাজ। তা ভাল, আমি খারাপ মানুষ, আমার সঙ্গে মিশে কাজ নেই।' বলিতে বলিতে তরুণ পণ্ডিত

মহাশয়ের চক্ষু দুইটী অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। সুধা হিরুর হাত দুইটী মুগ্ধভাবে ধরিয়া বলিল, 'আমি বুঝি আপনাকে এই সব বলছি? বলুন, আপনি আমার উপর রাগ করেননি।'

হিরুর চোখে বাস্তবিকই জলধারা ছুটিল। সুধাও কাঁদিয়া ফেলিল। তখন হিরু বলিল, 'ছিঃ সুধা, কাঁদতে আছে? আবার নতুন পণ্ডিত আসবে তোমার। আমি তোমার উপর একটুকুও রাগ করিনি। তোমার কথা আমার অনেক দিন মনে থাকবো।'

'না, আমি আর পড়বো না, পণ্ডিতমশাই। আপনি না এলে আমার পড়াও শেষ।'

হিরু তাড়াতাড়ি হাত ছাড়াইয়া চলিয়া আসিল। সুধা তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

বাড়ীতে আসিয়া হিরু বলিল, 'মা, দুটো কাজই আজ শেষ করে এসেছি।'

মোক্ষদা বলিলেন, 'আঃ, বাঁচলুম, এইবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছিস। এখন এক কাজ কর। আমি মেয়েকে রেঁধে শীগ্‌গীর চারটী ভাত দিই,—তুই ও-পাড়ার কৈবর্ত্তদের কোন্ ছেলেটীর অসুখ করেছে একবার দেখে আয় ত, বাবা। কাল থেকে কেউ ত আর এ বাড়ীর ছায়া

মাড়ায় না, তা আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি, ততক্ষণ এ সব কথা শুনে কেমন করে চুপ করে থাকি বল্‌! ছেলেটার একটা ব্যবস্থা করে তবে বাড়ী আসিস্‌।'

হিরু তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। দুয়ারের আড়াল হইতে মোক্ষদা হিরণ্ময়ের দিকে দেখিতে দেখিতে আঁচলে চক্ষু মার্জ্জনা করিলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, 'হাঁ, ওই ত সেই! ওগো, তোমার পাদুখানি যে এখনো বুকে করে আছি। তোমার পদ-লাঞ্ছন এই বুকে আমি যে জগতের ব্যথা বইছি। আমায় শক্তি দাও, দেবতা আমার!'

চক্ষু মুছিয়া ডাকিলেন, 'শিউলি, আয় মা, বড় বেলা হয়ে গেছে। আহা, বাছার অমন সুন্দর মুখখানি একেবারে শুকিয়ে গেছে! তুই যে আর-জন্মে আমার মেয়ে ছিলি, মা, তাই এ জন্মে তোকে ফিরে পেয়েছি।'

শিউলি কহিল, 'মা, আর কত দিন আমার জন্য লাঞ্ছনা সইবে? ভগবান আমায় অনেক সয়বার ক্ষমতা দিয়েছেন, নইলে আর এখনো বেঁচে আছি! কিন্তু আমার জন্য তোমরা মায়ে-বেটায় ভুগতে যাবে কেন? আমায় মা বিদায় দাও, আমি ওই রাক্ষসকে নিয়ে আবার যেখান থেকে এসেছিলাম, সেখানে চলে যাই!'

'ঐ নাও! আবার সেই সব! মা বুঝি ছেলেকে রাক্ষস বলে রে বেটী? বেশ মেয়ে তুই মা!'

শিউলি মাতৃস্নেহে বঞ্চিতা। সে আবেগে মোক্ষদার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল।

৭

পাড়ার ছেলেমহলে মহা সোরগোল পড়িয়া গিয়াছে। যারা স্কুল, পাঠশালা ও চতুষ্পাঠীর ছাত্র, যারা অধ্যয়নের জন্য নিত্য হিরণ্ময়ের নিকট যাতায়াত করিত, তাহারা বিষম সমস্যায় পড়িয়াছে। হিরণ্ময় যে অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিয়াছে, তাহাতে পাড়ার সকলেই তাহার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছে। কেহই তাহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন নহে। হিরণ্ময়ের সংস্রবে আর কেহ আসিতে চায় না। কিন্তু হিরণ্ময়কে বাদ দিয়া তাহারা যে নিজের অস্তিত্বই ভাবিতে পারিত না। জিমন্যাষ্টিকে হিরু, মাষ্টারগিরিতে হিরু, অর্থসাহায্য ও পুস্তক সাহায্য করিতে হিরু, পরামর্শদানে হিরু,—তাহাকে ছাড়িয়া তাহারা বাঁচিবে কিরূপে? কিন্তু বাড়ীর কঠোর নিষেধ অমান্য করিবারও কাহারো শক্তি ছিল না। সুতরাং আপাততঃ তাহারা হিরুর নিকট যাওয়া বন্ধ করিল।

পাড়ার যুবকমহলে একটা বিষম আন্দোলন চলিতে লাগিল। হিরুকে যাহারা দেখিতে পারিত না, তাহার অপূর্ব্ব মেধা ও চরিত্রশক্তি দেখিয়া যাহারা ঈর্ষাপরায়ণ,—তাহারা হিরুর নামে নানারূপ কুৎসা প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সুরেন বলিল, 'আচ্ছা, উচ্ছিষ্ট ভোজনে কি এতই তৃপ্তি? এ পিরীত কত দিন ধরে চলছিল কে জানে! কাঁচা বয়েসের এমনি টান!' নরেন্দ্র হাসিয়া বলিল, 'আরে, তুমি বোঝো না, সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র। ও যে উর্ব্বশী। যে রূপে বীর ধনঞ্জয় মুগ্ধ, সে রূপে আজ হিরণ্ময়ও মূর্চ্ছিত!'—এই সব কুৎসা-ময় কাহিনী হিরণ্ময়েরও কর্ণগোচর হইতে লাগিল। সে নীরব হইয়া রহিল।

পাড়ার সকলেই যখন হিরণ্ময়-বিদ্বেষী, তখন একজন মাত্র তার অনুরাগী বন্ধু ছিল। সে বৈদ্যদের ছেলে অপূর্ব্ব। তার বাপ-মা ছিল না। সে ভগ্নীর আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়া এবার বি-এ-পাশ করিয়াছে। সঙ্গীতে, চিত্রবিদ্যায়, কবিতা রচনায় সে খুব সিদ্ধহস্ত। হিরণ্ময়ও দূর হইতে তাঁহাকে সসম্ভ্রমে নমস্কার করিত। সকলে তাহাকে 'পাগলা অপি' বলিত, কারণ তার আচার ব্যবহার ছিল অদ্ভুত, আর মনটা ছিল বড় সাদা।

সেদিন কৈবর্ত্তদের ছেলেটীর সৎকারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া সে বাড়ী ফিরিতেছে, এমন সময়ে পথে অপূর্ব্ব'র সঙ্গে দেখা। অপূর্ব্ব হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি দাদা, খবর কি ?'

'কেমন আছ অপূর্ব্ব ?'

'ভাল আছি, দাদা, তোমার আশীর্ব্বাদে। চল, দাদা, আজ তোমাদের বাড়ী যাই, আজ মায়ের পাতে প্রসাদ পাবো।'

সকলের অন্তঃপুরেই অপূর্ব্ব'র অবারিত গতি। মোক্ষদাসুন্দরী এই অদ্ভুত প্রকৃতির যুবকটীকে বড় স্নেহ করিতেন। অপূর্ব্ব ছিল—তীরের মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি, আর সে তীরের মতই স্বৈরগতি ছিল। সে কোন বাধা মানিত না। বাধা অতিক্রম করাতেই তার আনন্দ ছিল। সমাজে, জীবনে, কথাবার্ত্তায়, চালচলনে সে একজন পুরাদস্তুর বিদ্রোহবাদী। সকলের নিকট যেটা সোজা রাস্তা, তাহাই বর্জ্জন করা তাহার ধর্ম্ম ছিল। কোন ধর্ম্মই সে মানিয়া চলিয়া সমাজের কঠোর গণ্ডীর ভিতরে থাকিতে পারিত না—আহার, নিদ্রা ইত্যাদি বাসনার মত ধর্ম্মও একটা মনের বাসনা,—মন যাহা ইঙ্গিত করে তাহাই তাহার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সুগঠিত দৃঢ় বীরোচিত মূর্ত্তি—

দেখিলেই মনে হইত, বুঝি লোকটার বুকের নীচে হৃদয় বলিয়া যন্ত্রটা মোটেই নাই। কিন্তু তাহা নয়। পরের দুঃখ যে নিজেরই দুঃখ—এ জ্ঞানটা হিরণ্ময়ের চেয়ে তার বড় কম ছিল না। তাই তাহার চিত্র-বিক্রয়-লব্ধ অর্থের এক পয়সাও বাড়ীতে আসিত না। সেজন্য জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর নিকট সে সর্ব্বদাই তিরস্কৃত হইত। তাহার মতে রূপার চাকতি-গুলা বিনিময়ের যন্ত্রস্বরূপ, তাহাতে কাহারও একলার অধিকার নাই। শাসনের নিষ্ঠুর দণ্ড সে কখনো দেখে নাই, তাই কেমন করিয়া শাসনানুগামী হইতে হয়, সেটা তার ঠিক জানা ছিল না। হিরণ্ময়ের চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও সে তাহাকে দাদা বলিয়া ডাকিত।

হিরুদের বাড়ীর ভিতর ঢুকিতেই অপূর্ব্ব'র সহিত শিউলির চোখোচোখি হইয়া গেল। শুধু নিমেষের মধ্যে অপূর্ব্ব দেখিল—মেয়েটীর মুখখানি বড় সুন্দর। টানা চোখ দুটাতে কি একটা মাদকতা আছে।

অপূর্ব্ব শিউলির কাহিনী সব শুনিল। শুনিয়া একটুও বিচলিত হইল না, বরঞ্চ বলিল, 'মা, আমি হলেও হিরুদার মত করতুম। আমি কারুর কথা শুনতুম না। সমাজ কি? সমাজ ত শুধু নিজ স্বার্থের পুঁজিপাটা নিয়ে চিরকাল বসে আছে। আদিম কাল থেকে হিন্দুসমাজ

শুধু ত্যাগই করে এসেছে। দুঃখীকে সে চিরকাল ত্যাগই করে এসেছে। কি বল হিরুদা?'

হিরুর মুখে কথা ফুটিল না। কয়দিন হইতে শিউলির নবজাত সন্তানটী তড়কায় ভুগিতেছিল। গ্রামের ডাক্তার দেখিয়া গিয়াছেন। রোগীর অবস্থা যে ভাল নয় এ কথা তিনি স্পষ্ট করিয়া না বলিয়া গেলেও, হিরণ্ময় তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। সে শিউলির ঘরে গিয়া শিশু কেমন আছে জিজ্ঞাসা করিল।

শিউলি বলিল, 'ছেলেটা কেবলই চমকে উঠছে। ও কি আর বাঁচবে দাদা? ও যে আমায় শুধু জ্বালাতেই এসেছিল। দশমাস যখন আমার অঙ্গের সঙ্গে এক হয়েছিল, তখনই আমি পথে বসেছিলাম। তার পর সকলে যখন তাড়িয়ে দিলে--তখনও ভেবেছিলুম যে, এক দিন এই দুঃখের ফুল আমার আশীর্ব্বাদ হবে। কিন্তু এ-ও আমায় ছেড়ে চললো—'

শিউলি কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার বিকচ মুখে কোথাও একটু ত্রুটী নাই। তাহার অরুণগণ্ডে মুক্তাফলের মত অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িল। হিরু বলিল, 'দিদি, কেঁদে আর কি করবে বল? যা হবার, সে ত হবেই। মানুষ হাত দিয়ে কি মরণকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে?

মৃত্যু যে আমাদের সকলের চেয়ে নিকটাত্মীয়,—সকলে আমাদের ভুলে থাকতে পারে কিন্তু মৃত্যু তাঁর শঙ্কাহরণ মূর্ত্তি নিয়ে ধীরে ধীরে হঠাৎ একদিন আসবেই। তুমি কেঁদো না দিদি, তোমার কান্না দেখলে মা-ও আত্মহারা হয়ে পড়বেন। চুপ কর।'

কথা শেষ হইতে না হইতেই শিশুটী প্রচণ্ডভাবে চোখ চাহিয়া কাঠের মত শক্ত হইয়া গেল। ধীরে ধীরে তার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল। শিউলি আছাড় খাইয়া শিশুর বুকের উপর পড়িল। অপূর্ব্ব ও মোক্ষদা ছুটিয়া আসিল। আর একবার অপূর্ব্ব সেই লোকললামভূতা রুদ্যমানা তরুণীকে ভাল করিয়া দেখিল। তার কেশবাস অসংযত হইয়া পড়িয়াছে, লুণ্ঠিত কুন্তলরাশি পৃষ্ঠের উপর অন্ধকারের মত ছাইয়া ফেলিয়াছে, শাঁখা-পরা নিটোল হাত দুইখানি যেন রাজরাণীর মতই কমনীয়। তাহাকে একবার দেখিলেই মনে হয়, যেন একটা স্বর্গের সঙ্গীত প্রাণময়, দেহময় হইয়া ধরাধামে আসিয়া পড়িয়াছে। অপূর্ব্ব ভাবিল, এ কোন্ রাজ্যের নারী? এর দুঃখ কিসের? সৌন্দর্য্য ত দুঃখহীন। অপূর্ব্ব বলিল, 'হিরুদা, একে এখন সরিয়ে নিয়ে যাও। আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলি।'

মোক্ষদা শিউলিকে ঘাটের দিকে লইয়া গেলেন। অপূর্ব্ব মৃত শিশুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

'দেখ, হিরুদ', এই যে এত বড় একটা কাণ্ড হয়ে গেল, এর জন্য দায়ী কে? তুমি ত ভট্‌চাযিার ছেলে, নিষ্ঠার নিগড়ে বাঁধা, ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী মন্ত্র পড়ে তবে মুখে জল দাও। কিন্তু আমাদের এই বিশাল হিন্দু সমাজ বালবিধবাদের জন্য কি কোনো ব্যবস্থা করেছে? সত্তর বছরের বুড়ো একজন চতুর্দ্দশীর হাত ধরে দন্তহীন মুখে হাসতে হাসতে বাসর ঘরে যাবে, কিন্তু সেই চতুর্দ্দশী যখন স্বামীহারা হবে, তখন তার ভাগ্যে স্রোতের মুখে কুটোর মত ভেসে যাওয়া ছাড়া আর কোন গতিমুক্তি নেই। কেন, তার কি প্রাণ নেই? সে কি সুখ দুঃখ অনুভব করতে পারে না? তার জীবনে কি কোন সাধ, বাসনা, আনন্দ নেই? শাস্ত্র তাকে আষ্টেপিষ্টে শাসনের শৃঙ্খল দিয়ে বেঁধেই তৃপ্ত হয় নি, সংসারও তাকে সজোরে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এই অমানুষিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কথা বলতে গেলেই তোমার শাস্ত্র রুখে দাঁড়িয়ে চোখ রাঙ্গাবে, ধোপা নাপিত বন্ধ করবে,—ধিক্ এই প্রাণহীন শাস্ত্রকে!'

'দেখ, অপূর্ব্বদা, শুধু শাস্ত্রের নিন্দা করলেই চলবে না। শাস্ত্র কি?—মানুষই ত শাস্ত্র গড়েছে! সমাজে যা প্রয়ো-

জন হয়েছে, সেই প্রয়োজনগুলাকে সুসঙ্গত ও ব্যবস্থাবদ্ধ করবার জন্যই ত শাস্ত্র। কিন্তু মানুষ যদি নিজেকেই হীন করে ফেলে, শাস্ত্র তখন আর কি করবে? 'প্রবৃত্তির দাস হয়ে মানুষ কি না করছে বল? শাস্ত্র মানুষকে সংযত হতে ব'লেছে, সৎ হতে বলেছে, সুন্দর হতে বলেছে। তা না হয়ে মানুষ যখন পশুর অধম হয়ে পড়বে, তখন তার শাস্ত্রের কঠোর শাসন ছাড়া আর দ্বিতীয় পন্থা নেই।'

'তুমি যে একটু ভুল বুঝলে হিরু! মানুষ যে-সব ক্ষুধিত, তৃষিত প্রবৃত্তিগুলি নিয়ে জন্মেছে—সেগুলো সে কেমন করে ভুলে গিয়ে একেবারে দেবতা হয়ে উঠবে? প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ একটা সামান্য ভুল করে ফেলেছে বলেই সে একেবারে শয়তান হয়ে গেল?'

অপূর্ব্ব সমাজ-সমালোচনার লেকচার এইখানেই শেষ করিল। তার তর্কের উচ্ছ্বাসে হিরুর পূর্ব্বমত একটুও টলিল না। সে শুধু নির্ব্বাক্ হইয়া সরল শিশুর মত অপূর্ব্ব-দা'র রোষদীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

৮

বাপ-মায়ের বড় আদরের একটী সন্তান ছিল শেফালিকা। তার বাবা সরকারী চাকরি করিত। বিষ্ণু কামারের ব্যবসা, প্রতিপত্তি, প্রকাণ্ড বাড়ী, সম্মান—এই

সব দেখিয়া তার ছোট ছেলের সঙ্গে সে শিউলির বিবাহ দিয়াছিল। শিউলি প্রাপ্ত বয়স পর্য্যন্ত মেয়ে স্কুলে গিয়াছিল,—বড় লোকের মেয়েদের সঙ্গে মিশিয়া সে বেশ বিলাসিনী হইয়া উঠিয়াছিল। সংসারের কাজ সে কিছুই জানিত না। তাই যখন শ্বশুরবাড়ীর দুঃখময় জীবনের মধ্যে গিয়া পড়িল ও একে একে পিতৃকুলের সবাই মরিয়া গেল, তখন মেজো যা-এর গঞ্জনা ছাড়া আর তার কিছুই সম্বল রহিল না। সে ভাত সিদ্ধ করিতে জানিত না, পান সাজিতে পারিত না, তামাক সাজিতে পারিত না, ঘর ঝাঁট দিলেও চারিদিকে ধূলা জমিয়া থাকিত। অথচ কেমন করিয়া টেক্কা বা হরতন খোঁপা করিতে হয়, ব্রাহ্ম-ধরণের শাড়ী পরিতে হয়, বুকের ব্রুচ্‌টা কোন্‌খানে আঁটিলে বেশ মানানসই হয়,—এ সবই তার বিশেষ করিয়া জানা ছিল। মূর্খ স্বামীর আদর সে কখনো পায় নাই। শ্বশুরবাড়ীতে সে শহরের একটা কিম্ভূতকিমাকার জীব বলিয়াই গণ্য হইয়াছিল, তাই তাহার সেখানে আদর ছিল না।

ধনঞ্জয় রূপবান যুবক—তার লম্বা টেরী, চোখে চশমা, গায়ে পাঞ্জাবী, চোখ দু'টী বেশ স্বপ্নময়—এ-সব শিউলির মন্দ লাগিল না। মেজো জায়ের অবর্তমানে শিউলি অনেক

কষ্টে প্রায় ছয়মাস বৃদ্ধ শ্বশুরের সংসার চালাইয়াছে, সেই সময়ে ধনঞ্জয় তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে। কিন্তু একদিন যে সে সত্যই শিউলিকে ভালবাসিয়াছিল! হায় হত-ভাগিনী! -- তখন সে তাহার ভালবাসার মূল্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই। এখনও কি পারিয়াছে? তাহার মনে যে একটা বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা,—দুঃখের ও বেদনার অভিঘাতে এই আঠারো বছরের সঞ্চিত ক্ষুধা একটুও ত শান্ত হয় নাই! তার পাপের বেদনাময় নিদর্শন যে শিশু পুত্র, সে-ও তাহাকে আর লজ্জা না দিয়া, যেখান হইতে আসিয়াছিল, নীরবে আবার সেইখানে চলিয়া গিয়াছে। হিরণ্ময়দের শান্তিময় গৃহে আসিয়া সে দেবতার চরণকমলে আত্মনিবেদন করিতে পারিল না কেন? সে কি বুঝে নাই যে, তাহাকে সংসারে আনিয়া এই মাতাপুত্র সর্ব্ব স্বার্থ বলি দিয়া তাহার জন্য কত কষ্টই সহ্য করিতেছে? প্রত্যহ চার ক্রোশ রাস্তা পার হইয়া হিরণ্ময় একটী ছেলেকে পড়া-ইয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনে, তাহাতেই অতি কষ্টে তাহাদের সংসার চলে। গ্রামে হিরণ্ময়ের স্থান নাই, সমস্ত গ্রামবাসী এই স্বাধীনচিত্ত ক্ষুদ্র পরিবারটীকে জন্মের মত এক ঘরে করিয়া রাখিয়াছে। সে কি এসব দেখি-তেছে না? তাহার জন্য এ কষ্ট সহিবার তাহাদের প্রয়ো-

জন কি ? প্রাণ দিয়াও তাহাদের এই অসীম দয়ার ঋণ সে পরিশোধ করিতে পারিবে কি ?

তাহার চারিদিকে আকাঙ্ক্ষার আগুন জ্বলিয়া উঠিল কেন ? জ্বলিয়া উঠিল ত সে একেবারে পুড়িয়া মরিল না কেন ? তাহার যে মরিলেই ভাল হইত। এই সৌন্দর্য্যই যে তাহার কাল হইল। সে অভাগিনী না হইলে এমন সংসারে তাহার বিবাহ হইবে কেন ? সে কি বিষ্ণু কামারের মূর্খ পুত্রের যোগ্যা ? প্রথম হইতেই যে ভগবান তাহার উপর একান্ত অবিচার করিয়াছেন। এই নিবিড় কুন্তলরাশি, এই আরক্ত ওষ্ঠাধর, এই নবনীকোমল সুকুমার বাহুযুগল, এই পূর্ণযৌবন—এ সমস্তই যে পাপের মসী-প্রলেপে কুৎসিত হইয়া গিয়াছে! এই চির-বুভুক্ষিত যৌবন জীবনের যে কোন বাসনাই পূর্ণ করিতে পারে নাই! সে যেখানেই গিয়াছে, সেইখানেই তার ভুবন-আলো-করা রূপের জন্য অজস্র শুষ্ক ও ঘৃণামিশ্রিত প্রশংসা পাইয়াছে,—কিন্তু দয়া বলিয়া কিছু ত হিরণ্ময়ের সংসার ছাড়া আর কোথাও পায় নাই! গ্রামের জমীদার যদু মুখুয্যে বাকী খাজনার দায়ে বিষ্ণু কামারের সর্ব্বস্ব নিলাম করিয়া লইয়াছে, বিষ্ণু কামার এখন সামান্য কুটীরবাসী হইয়া অন্ধজীবনের শেষ কয়টা দিন দ্বিতীয়া পুত্রবধূকে লইয়া

কাটাইতেছে। তাহার ভাসুর শিবচরণ গ্রামের গুলির আড্ডার প্রধান পাণ্ডা। তাহার নিরুদ্দিষ্ট স্বামী এতদিনে নিশ্চয়ই মরিয়া গিয়াছে। স্বামীর ভালবাসাই কি সে একদিনের জন্য পাইয়াছিল? সে স্বামীকে মূর্খ বলিয়াই জানিত, স্বামীকে সে কোনোদিন শ্রদ্ধা বা প্রীতির চক্ষে দেখে নাই। তাহার স্বামী রাইচরণ বিবাহের পর এক-দিন তাহাকে সাজিতে দেখিয়া বলিয়াছিল, 'দেখ, শিউলি, তুমি কার জন্যে অমন করে সাজো বল ত? তোমায় ত এমনি খুব সুন্দর দেখায়!' তখন তাহার শ্বশুরের অবস্থা খুবই ভাল ছিল, লোহার ব্যবসায়ে তখন প্রচুর লাভ হই-তেছে। তার পর একদিন কোথায় কেমন করিয়া সেই সংসার-তরণীতে একটা ফুটো হইয়া গেল,—যখন ইহা হুস্ করিয়া ডুবিয়া গেল তখন নিমজ্জমান প্রাণী কয়টা বেশ ভাল করিয়া বুঝিতেই পারিল না যে ব্যাপারখানা কি! সেই সব ভরা সন্ধ্যা, উৎসবময়ী রজনী, মধুর প্রভাত আর কর্ম্মগুঞ্জন পরিপূর্ণ সুদীর্ঘ মধ্যাহ্নগুলি,—তাহা আজ স্বপ্নের মতই অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে! সে যে আপনার সৌন্দর্য্য-গর্ব্বকে চিরকাল হৃদয়ের বেদীর উপর বসাইয়া তাহাকে দেবতার উপায়নে পরিতুষ্ট করিয়াছে, আজ পাপের পঙ্কিল-তায় কলুষময় হইয়াও সে যে আপনার সৌন্দর্য্যকে ভুলিতে

পারে নাই! তাই হিরণ্ময় প্রভাতে পুষ্পসম্ভার লইয়া যখন সংযতমনে দেবতার দূতের মত প্রশান্তমুখে পূজার ঘরে গৃহ-দেবতা মধুসূদনের পূজা করিতে যাইত, তখন শিউলির বুকের ভিতরটা ভয়ানক কাঁপিয়া উঠিত। সে ভাবিত—এই ত জীবন! হোমশিখার মত পূর্ণায়ত, উজ্জ্বল, পবিত্র এই জীবনের কাছে সমস্ত বাসনা যে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে! কিন্তু, কই, একদিনও ত সে ভক্তিভরে তুলসীতলায় সন্ধ্যার প্রদীপালোকে প্রণাম করিতে পারে নাই! ব্রাহ্মণের ঘরে তার জন্ম হয় নাই সত্য, কিন্তু একদিন সে যে বড়-লোকের মেয়ে ও বড় লোকের বউ ছিল! আজই না হয় তার কপাল ভাঙ্গিয়াছে, কিন্তু একদিন তার শ্বশুরের অবস্থা যে জমীদার যদু মুখুয্যের চেয়েও ভাল ছিল!

এখন সেই পাপের কথা মনে হইলেও শিউলির আর ভয় করে না। এঁরা যখন দয়া করিয়া আশ্রয়ই দিয়াছেন, তখন ত পরবর্ত্তী জীবনের দিন কয়টার সম্বন্ধে একরূপ নিশ্চিন্তই হওয়া গিয়াছে। প্রায় ছয়মাস হইল সে এ বাড়ীতে আসিয়াছে, ইতিমধ্যেই সে হিরুর নিকট সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার ব্যাকরণ পাঠ অনেক দূর অগ্র-সর হইয়া গিয়াছে। হিণ্ময়ের যৌবনোজ্জ্বল মহেন্দ্র-নিন্দিত কান্তি দেখিয়া শিউলি অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিত। সে

চাহিয়া থাকিলেই হিরুর কেমন একটা লজ্জা করিত, হিরু চোখ দুটী নীচু করিয়া আপন বক্তব্য বিষয় বুঝাইয়া যাইত। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিতে পারিত যে শিউলি সপ্রতিভভাবে মুগ্ধনেত্রে অপলক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে। তখন তাহাকে 'দিদি' বলিয়া ডাকিতেও তার প্রবৃত্তি হইত না মনে হইত—সে বুঝি মস্ত বড় একটা ব্যভিচার করিয়া ফেলিয়াছে! সে শুধু বলিত, 'হাঁ, আজ এই পর্য্যন্ত! কাল এইখানটা পড়া হবে।'

কি সুন্দর হিরুর হাত দুটী! কি কোমল তার চাউনি! কি অমায়িক সরল ব্যবহার তার! শিউলির মানস-কমল সম্ভ্রমে আনত হইয়া পড়িত।

হিরু আর একটী ছাত্রীর কথা ভাবিত। তার মেধা, তার প্রতিভা, তার গভীর শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাবটী এখনো তার বেশ মনে আছে। সে শিউলির চেয়েও সুন্দর। শিউলি বিকচ পুষ্প, আর সে যে পুষ্পকোরক। যখনি হিরু শিউলির দিকে চাহিত, তখনি মনে হইতে, তার জীবনের উপর দিয়া পাপের একটা ঘূর্ণী ছুটিয়া গিয়াছে। কিন্তু এ কি অপরূপ সৌন্দর্য্য তার! যে ঝড়ে মানুষ দানবমূর্ত্তি হইয়া যায়, সে ঝড়ে শিউলি সত্য সত্যই শরৎ প্রভাতের নবীন শেফালিকার মত প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। হিরু বুঝিতে

পারিত না—কেন এত লজ্জা করিত তার! আজকাল সুদীর্ঘ মধ্যাহ্ন্‌গুলি সে নিজের ঘরে শাস্ত্র-চর্চ্চা করিয়া কাটাইত, সংপ্রতি সে উপনিষৎপাঠে মন দিয়াছে। কিন্তু এই শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া যে অমৃত উঠিত, তার চেয়ে ঢের বেশী উঠিত সংশয়ের হলাহল। সে ভাবিয়াই পাইত না—সৃষ্টিচক্রের কোন্ খানে ঈশ্বর আছেন! একজন দয়াময় স্বর্গের বেদীতে বসিয়া আছেন ত শিউলি স্বামীর ঘর করিতে পাইল না কেন? ঈশ্বর যদি সর্ব্বশক্তিমান্, তবে তিনি শিউলিকে পাপ হইতে বাঁচাইলেন না কেন? তাহার তেইশ বছর বয়স হইয়া গেল—সে ত জীবনের কোন আদর্শেরই সন্ধান পাইল না! অথচ সংশয়বাদী হইয়াও অপূর্ব্ব-দা' ত বেশ মনের সুখে আছে। এক-একবার ইচ্ছা হইত—সে তাঁহারই মত হয়! সে নিজের চেষ্টায় বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে বি-এ পাশ করিয়াছে, কিন্তু, কই, ইংরাজী পুস্তকের মধ্যেও ত কোথাও তার সংশয়ের নিরসন হইল না। সে ব্যাকুলভাবে সন্ধ্যাকাশের দিকে চাহিয়া থাকিত। আকাশে এক একটী করিয়া নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিত, রাত্রি গভীরতর হইয়া আসিত, চারিদিক নিস্তব্ধ হইয়া যাইত, মোক্ষদা ডাকিতেন—'হিরণ্ময়—হিরু!'

হিরণ্ময়ের যেন যোগভঙ্গ হইত। পুত্রের এই অন্যমনস্ক

ভাবটী মাতা কিছুদিন হইতে লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে তাঁরা দুইজনে সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া শুধু সমাজের চক্ষুশূল হইয়াছেন। পাড়ার যে-সমস্ত কুচক্রী লোক আছে, তাহারা অশেষ প্রকারে তাহাদের লাঞ্ছিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহা ব্যতীত শিউলির ব্যবহারও বড় ভাল নয়। প্রথমতঃ সে ত কোন কাজই জানে না,—তার পর বিধবার অত বেশভূষার পারিপাট্য কেন? সে কি তাহার গত জীবনের সমস্ত কথা ভুলিয়া গিয়াছে? তাহার মনে কি একটুও অনুশোচনা হয় নাই? শিউলির সম্বন্ধে যে কি করিবেন, তাহা মোক্ষদা ভাবিয়া উঠিতে পারিতেন না। হিরণ্ময়ও বড় হইয়া উঠিয়াছে, মনের মত একটী বধূ আনিতে পারিলে মোক্ষদার জীবনের শেষ সাধটী মিটিয়া যায়। কিন্তু সমাজে ত আর তাঁহাদের কোনই স্থান নাই, শিউলিকে গ্রহণ করিয়া তাঁহারা ত সকলের নিকট পরিত্যক্ত হইয়াছেন। কে তাঁহার ঘরে কন্যা সম্প্রদান করিবে? গ্রামের যিনি জমীদার, তিনিও তাঁহাদের উপর বিরক্ত। পূর্ব্বে তিনি তাঁহাদের কত খোঁজখবর লইয়াছেন, কিন্তু এখন তিনি তাঁহাদের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়াছেন। এতদিন হিরুর মুখ চাহিয়া তিনি সকল বিপদ বুক পাতিয়া লইয়া-

ছিলেন, কিন্তু এখন সহসা তাহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া তাঁহার মনের ভিতরটা সব উলট-পালট হইয়া গেল, তিনি অনেক দিন পরে আজ ভাবিলেন যে কোথায় কি একটা গোল রহিয়া গিয়াছে।

শিউলি ক্রমশঃ হিরণ্ময়ের গুণানুরাগিনী হইয়া পড়িতেছিল। সব কাজেই হিরণ্ময়ের বেশ একটা জোরালো ব্যক্তিত্ব আছে। এই পুরুষোচিত আত্মগর্ব্বটা শিউলির বড় ভাল লাগিত; আর তদুপরি ছিল—তার হিরণ্যদ্যুতি সম্পন্ন অপূর্ব্ব কনককান্তি। এমন সুন্দর পুরুষ শিউলি যে জীবনে কখনো দেখে নাই। হিরু কিন্তু একদিনও তাহার দিকে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া দেখে নাই। তাহার সেই প্রসন্ন, সরল, সদাহাস্যময়, অকপট দৃষ্টি দেখিয়া শিউলি হিরণ্ময়ের সৌন্দর্য্যানুভূতি বিষয়ে হতাশ হইয়া গিয়াছিল। এ পর্য্যন্ত শিউলির রূপে পাগল হয় নি কে! রমণীদের মধ্যে এমন অনেক সুন্দরী আছে, যারা পুরুষকে শুধু রূপের ফাঁদে ফেলিতে চায়, বঁড়শী-বিদ্ধ মাছের মত তাহারা পুরুষকে অনেকক্ষণ খেলাইয়া শেষে নিরাশ করিতে চায়। শিউলির মনটাও কতকটা এই ধরণের। তাহাকে 'সুন্দরী' বলিয়া তারিফ্ করিলে তাহার গর্ব্বের ও আনন্দের সীমা থাকিত না। কিন্তু এই শান্তিময়, শাস্ত্রানুশাসন-নিয়ন্ত্রিত পরিবারের

মধ্যে আসিয়া সে যেন এক নূতন রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার যে একটা বিরাট্ সৌন্দর্য্যময় ব্যক্তিত্ব আছে, এ কথা যেন কেউ মানিতেই চায় না! হিরণ্ময়ের প্রতিভা-দীপ্ত উজ্জ্বল বদনমণ্ডলের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কতবার সে মনে করিয়াছে যে তার সুন্দর হাত দুখানি একবার সে গ্রহণ করে। গ্রহণ করিয়া একবার সে বলে—ওগো পাষাণের দেবতা! তোমার কি প্রাণ নাই? তুমি কি অনুভব করিতে জানো না? তোমার রসানুভূতি নাই? যৌবন নাই? যৌবনের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা নাই? কিন্তু বড় লজ্জা করিত, ভয় হইত,—হিরুর ইন্দ্রিয়দমন দেখিয়া তাহার প্রতি একটা ক্রূর হিংসা জাগিত। হিরুর মনে ত কোনই বিকার নাই—তাহারই বা এত আকিঞ্চন কেন? তাই আজ তাহার মনে পড়িতেছিল—অপূর্ব্বের সেই জ্বালা-ময়, বুভুক্ষাপূর্ণ চাহনি—সেই চাউনি হইতেই ত তাহার মনে আবার বাড়বানল জ্বলিয়া উঠিল। অপূর্ব্ব—অপূর্ব্ব। অপূর্ব্ব—হিরণ্ময়!—দু'জনের মধ্যে কে বেশী সুন্দর? হিরণ্ময়ের প্রশান্ত, যোগম্লান, শিশুসুলভ ভাবটী শিউলির মনের তারে-তারে মিশ্র বেহাগের দোদুল ছন্দ বাজাইয়া যাইত। কিন্তু সে কে—সে কে! সে যে পতিতা, সমাজ-চ্যুতা কায়স্থকন্যা! আশ্রয়দাতার সম্বন্ধে এ সব কুৎসিত চিন্তা

তার কেন? সে কিছুই বুঝিতে পারিত না, হঠাৎ মোক্ষদার দুটী পায়ের কাছে পড়িয়া বলিত, 'মাগো, তোমার দুটী পায়ের ধূলা দাও।' মোক্ষদাসুন্দরী অবাক্ হইয়া বলিতেন, 'ওরে হিরু, দেখে যা আমার পাগলি মেয়ের কাণ্ড।' শিউলি পাদুটী দৃঢ়তর ভাবে জড়াইয়া বলিত, 'ওঁকে আর ডাকবেন না মা, আপনার দু'টী পায়ে পড়ি।'

এই রকম করিয়া প্রায় আরও ছয় মাস কাটিয়া গেল।

৯

সুধার বিবাহের জন্য যদুনাথ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সংসারে তাঁহার কোনই অভাব নাই, অথচ নিরানন্দ গৃহে তাঁহার সুধা ছাড়া একটুও আনন্দ নাই। দুঃখে, শোকে, মানসিক অবসাদে তাঁহার স্ত্রী একরূপ শয্যাশায়িনী। সুধা সবে বারো বৎসরে পড়িয়াছে, এতদিন তাহার স্নেহ-কৌতুকের মায়ায় বুড়া দাদামহাশয়ের মনটী আচ্ছন্ন থাকিলেও, এইবার তিনি প্রকৃতপক্ষে বুঝিয়াছেন যে, সুধা তাঁহার নয়। নারী হইয়া জন্মিলে তাহার উপর পিতৃকূলের আর কোনই অধিকার থাকে না,—এ কথাটা যদুনাথ বোধ হয় স্নেহের আতিশয্যবশতঃই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এমনি

করিয়াই তাঁহার দুইটী কন্যার খুব বড় জমীদার গৃহেই বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা ফুলের মত অকালে ঝরিয়া গিয়াছে। ফুল ঝরিয়া গেলে কোরক থাকে, সেই কোরক আবার পুষ্পিত হয়,—পুষ্প ঝরিয়া যায়, কিন্তু মুকুল থাকে। সৃষ্টির এই বৃত্তাকার নিয়মে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। কিন্তু সুধা যে তাঁহার বড় আদরের—তাহাকে কেমন করিয়া তিনি শ্বশুরবাড়ী পাঠাইয়া দিয়া বাঁচিয়া থাকিবেন? তাঁহার ইন্দ্রভুবন তুল্য প্রাসাদের প্রতি কক্ষে আসবাব-পত্র যথেষ্টই আছে, কিন্তু যে গৃহ একদিন লোক-কোলাহল-মুখর ছিল, আজ সেখানে প্রাণ কই! বড় বড় সুপ্রশস্ত মার্ব্বেল্-পাথরের হল্ ঘরগুলায় একটা বিরাট্ স্তব্ধতা ও শূন্যতা বিরাজ করিতেছে। সেই সব ঘরগুলার মধ্যে যখন বিচিত্র-বেশা সুধারাণী ছুটিয়া বেড়াইত, তখন যদুনাথের মনে হইত, সমস্ত বাড়ীখানা অপূর্ব্ব আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছে। সুধা আদরের দৌহিত্রী, দাদামহাশয় ও দিদিমার আদরে সে মাতৃশোক জীবনে কখনো অনুভব করিতে পারে নাই। কেবল একদিন সে রুগ্না দিদিমার শয্যা-পার্শ্বে গিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'হাঁ, দিদিমা, আমার কি মা নেই? আমার মা কোথায় গেল, দিদিমা?' দিদিমা অতিকষ্টে অশ্রু-সংবরণ করিয়া বলিতেন, 'তোমার মা স্বর্গে গেছেন,

দিদিমণি।' যদুনাথ দৌহিত্রীকে সংস্কৃত-বিদ্যায় পারদর্শিনী করিবার চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়াছিলেন। সহসা তিনি কোনও কাজ করিতে পারিতেন না। হিরণ্ময়কে জবাব দিবার পর হইতে সারা গ্রামে আর সংস্কৃতের পণ্ডিত পাওয়া গেল না—এমন কথাটা কেহ বিশ্বাস না করিলেও, আর কোনও পণ্ডিত তাঁহার পছন্দ হইল না। হিরণ্ময়ের মত তরুণ, সুন্দর, আচারনিষ্ঠ, তেজস্বী সংস্কৃতজ্ঞ সারা জেলা খুঁজিয়াও মিলিল না। শোকের ও দুঃখের নিদারুণ যন্ত্রণায় পড়িয়াও তিনি গীতার মধ্যে সান্ত্বনার অমৃতবাণী লাভ করিয়াছিলেন। নিজে আচারনিষ্ঠ বলিয়া শুদ্ধাচারী দেখিলেই তাঁহার মন দয়াসিক্ত হইয়া পড়িত। তাই কত ব্রাহ্মণ যে তাঁহার নিকট অর্থ সাহায্য লাভ করে তাহার ইয়ত্তা নাই।

ইতিপূর্ব্বে একটী জমীদারের ছেলের সহিত তিনি দৌহিত্রীর বিবাহ দিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু যেদিন শুনিলেন যে, ছেলেটী ইংরাজীতন্ত্রে পুরো মাত্রায় দীক্ষিত, অমনি তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। আচারবান্ ধনীপুত্র জামাতা দুনিয়ায় সহসা খুঁজিয়া পাওয়া বড় সহজ নহে। আজ তাঁহার স্ত্রীর নিকট বসিয়া এই সব কথা মনে হইতেছিল। সকালবেলা জমীদারীর কাজেই

অতিবাহিত হইয়া যায়; দ্বিপ্রহরে আহারাদি ও বিশ্রামে কাটে; অপরাহ্ণে বিচার-গৃহে বসিয়া প্রজাবর্গের আবেদন-নিবেদন শুনিয়া কাটিয়া যায়; সন্ধ্যায় সুধারাণীকে লইয়া একটু গাড়ী করিয়া বেড়াইয়া আসেন; তাহার পর রুগ্না স্ত্রীর শয্যা-পার্শ্বে আসিয়া বসেন।

তখন রাত্রির আঁধার ঘোর হইয়া আসিয়াছে। যদুনাথ পত্নীর শয্যা-পার্শ্বে আসিয়া বসিয়াছেন। জীবনকুমারী একটা র‍্যাপার্ মুড়ি দিয়া শুইয়াছিলেন।

যদুনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আজ কেমন আছ?'

র‍্যাপার্ অপসৃত করিয়া জীবনকুমারী বলিলেন, 'আর কেমন আছি! কেন যে ভগবান বাঁচিয়ে রেখেছেন, তা ত বুঝতে পারি না। পেটের ব্যথাটা এখনো কমেনি।'

'আজ কি বেশী কাশি হয়েছিল?'

'হাঁ, কাশিও খুব, রক্তও ছিল। আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে গো। দেখ, কর্ত্তা, আমি বেঁচে থাকতে সুধার একটা বিলি দেখে গেলে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারতুম। তুমি কি করছ, বল দেখি?'

এই বলিয়া নিতান্ত অসহায়ভাবে তিনি স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ঘরে টেবিলের উপর একটা সেজ জ্বলিতেছিল। সেই সেজের মৃদু আলোকে তিনি

দেখিলেন যে স্বামীর মুখে বিষাদ-কালিমার একটা ছায়া পড়িয়াছে।

'তুমি অত ভাবছো কেন গা? হিমু, বিধু দুজনেই চলে গেছে, অনাথও চলে গেছে, এখন বাকী কেবল আমি। তা আমার ভাবনাও তোমায় বেশী দিন ভাবতে হবে না। এখন সুধার একটা ব্যবস্থা কর। ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখলে আমার মরতে ইচ্ছে করে না। ওকে যে বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ করেছি, কর্ত্তা। তুমি ওর একটা ব্যবস্থা কর।'

'আমি কি চেষ্টা করছিনি গা? কিন্তু মনের মত পাত্র পাচ্ছি কোথায়? আজকাল ও-সব ইংরাজী বুলি-ওলা বাবুদের আমার পছন্দ হয় না।'

'একটা কথা কদিন ধরে আমার মনে হচ্ছে—না, থাক।'

যদুবাবু সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি—কি, বল না।'

জীবনকুমারী গম্ভীর হইয়া শুধু বলিলেন, 'না, সে তোমার পছন্দ হবে না।'

'আচ্ছা, তোমার মতটাই শুনি না।

'বলছিলুম-- ভট্‌চায্যি মশাইএর ছেলেটীকে তোমার পছন্দ হয়?'

'কে, হিরণ্ময় ?'

'হাঁ গো, হিরু।'

'আমারও মনে ঐ কথাটা জাগছিল, গিন্নি। কিন্তু ওর মা কি রাজী হবে ? আর তা ছাড়া একটা ভ্রষ্টা নারীকে ঘরে আশ্রয় দিয়ে ওরা সমাজচ্যুত হয়ে আছে। আমি ত ঐ রকম একটা তেজস্বী, নিষ্ঠাবান্ ছেলে চাই।'

'সমাজ কাকে নিয়ে গা ? তুমি যদি হিরুকে আশ্রয় দাও, ত সমাজ আর কি করবে ? আর হাজার হোক্ সে মেয়েটা ত মানুষ গা ! ওদের যে বড় দয়ার শরীর। মনে নেই, সেই ভট্‌চায্যি মশাই কৈবর্ত্তপাড়ায় গিয়ে দারুণ শীতে সব কাপড়চোপড় বিলিয়ে দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ী আসতেন ? তাঁরই ত ছেলে ! আচ্ছা, তুমি কথাটা একবার পেড়েই দেখ না।'

'বড় শক্ত গিন্নি। সংকল্পগুলো যতদিন মনের ভিতর থাকে, ততদিন আশা হয় বোধ হয় সফল হওয়া যাবে। কিন্তু কাজের মাঝখানে গিয়ে পড়লেই সব গুলিয়ে যায়। ওদের মা ও ছেলের মন এ জগতের ছাঁচে ঢালাই নয়। ওরা টাকা-আনা-পাই-এর হিসাব করে' বেঁচে নেই। জীবনটাকে ওরা নিজের ইচ্ছামতন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিয়েছে। দেখনি—ভট্‌চায্যি মশাই মরে যাবার পর বিধবার সেই

আশ্চর্য্য শক্তি? তবে আমি এক কাজ করতে পারি। নবগোপালকে চেপে ধরে' ধনঞ্জয় যাতে ঐ মেয়েটাকে বিয়ে করে, তার চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু অনেক দিনের লোক নবগোপাল, শেষে আবার বিগ্‌ড়ে না যায়!'

'তাই কর, কর্ত্তা, সেই বেশ। তাহলে অভাগা মেয়েটারও একটা কিনারা হয়। আমারও মোক্ষদাদিদির শক্ত শক্ত কথাগুলো এখনো মনে আছে। অমন না হলে স্ত্রীলোক! যাও, এখন পূজার ঘরে যাও, কর্ত্তা।'

যদুনাথ উঠিলেন। জীবনকুমারী ধীরে ধীরে কহিলেন, 'আমার চিরদিনের পাওনাটা বুঝি ভুলে গেলে—'

যদুনাথ ফিরিলেন। জীবনকুমারীর মস্তকের নিকট তিনি নিজ পদতল রক্ষা করিলেন। সাধ্বী নারী স্বামীর চরণ-রেণু গ্রহণ করিলেন।

'এই সামান্য পাওনাটা রোজই চুকিয়ে দিও। সেই নয় বছর বয়সে তোমার কাছে এসেছিলুম, বাপের বাড়ীর মুখ ত কখনো দেখিনি। আমি যে শুধু তোমাকেই জানি, কর্ত্তা। তোমায় কত কষ্ট দিয়েছি, বল'দেখি! আর কটা দিনই বা আছে, বল!'

যদুনাথের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি তাড়া-

তাড়ি 'নারায়ণ' 'নারায়ণ' বলিতে বলিতে ঘরের বাহির হইয়া গেলেন। গিন্নি আবার মুড়ি দিলেন।

এমন সময় সেই ঘরের পর্দা সরাইয়া সুধা আসিয়া ডাকিল, 'দিদিমা।' গিন্নি বলিলেন, 'এসো, দিদি।'

'দেখ, দিদিমা, আজ ভারি একটা বিপদ গেছে। দাদামশাই-এর কাছে সব শুনেছ ত?'

মুখটা গভীর আবরণের ভিতর হইতে বাহির করিয়া দিদিমা কহিলেন, 'না দিদি, আমি ত কিছুই শুনিনি। কি হয়েছে?'

'তবে শোনো, দিদিমা। আজ আমরা বিকেলে হাওয়া খেতে বেরিয়েছি—আমি আর দাদামশাই সেই বড় গাড়ী-খানা করে. এমন সময় বাঁধের মুখের কাছে এসে ঘোড়াটা খুব ক্ষেপে উঠলো। আর একটু হলে আমাদের গাড়ী-খানা উল্টে যেতো, আমি আর দাদামশাই দুজনেই পড়ে যেতুম—'

'আঁ, দুর্গা, দুর্গা! পড়িসনি ত?'

'না, দিদিমা, শোন না, তারপর কি হল।—দাদা-মশাই ভয় পেয়ে আমার হাত দুটা চেপে ধরে নামতে যাচ্ছেন, এমন সময় বৃদ্ধ কোচম্যান্ বললে—হুঁসিয়ার, রাজাবাবু! ভয়ে আমার বুক দুড়্ দুড়্ করতে লাগলো।

দাদামশাই-এর মুখে কথা নেই। "এমন সময় পণ্ডিত মশাই ছুটে এসে সেই দুরন্ত ঘোঁড়ার মুখ এমনি চেপে ধরলেন যে, পাগলা ঘোঁড়াটা শান্ত ছেলের মত মুখ হেঁট করে নিলে। দাদামশাই গাড়ী থেকে নেমে পণ্ডিত মশাইকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, পণ্ডিত মশাই খুব ভাল লোক,—না, দিদিমা ?'

'হাঁ, দিদি, ওর মা যে বড় লক্ষ্মী। ওরা ত কারু কাছে ঘাড় হেঁট করে না। ওরা দুঃখকে লক্ষ্মীর মত বরণ করে নিয়েছে। যেখানে বিপদ সেইখানেই হিরু ! আহা, ঐ রকম যদি তোর একটা বর হয়—'

'যাও—তোমার এক কথা ! তোমার সঙ্গে কথা কয়বার যো নেই !'

সুধার মুখমণ্ডল লজ্জার অরুণরাগে আরক্ত হইয়া উঠিল। সে আর পূর্ব্বের মত চঞ্চল নাই। সে এখন এক মনে বসিয়া কি ভাবে—নির্জ্জনে বসিয়া খাতার উপর অক্ষরে লেখে—শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় ভট্টাচার্য্য'। আকাশের তারা, বনের ফুল ও পাখী—এখন তার সঙ্গী। মেনি বিড়ালটা অনাদরে তার অঞ্চল-লগ্ন হইয়া বেড়ায়। তার কেবলি মনে পড়িত—পণ্ডিত মশাই-এর সেই তেজোব্যঞ্জক ব্যবহার, অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের মত সেই নির্ভীক ভাব, সেই

প্রশান্ত শিবসুন্দর জ্যোতি, আর শেষ দিনের সেই ব্যাকুল বিদায়। সে ধনীকন্যা, দুঃখের মর্য্যাদা সে জানে না, দুঃখের কঠোরতার সম্বন্ধেও তার কোন ধারণা নাই। তথাপি, সে বুঝিয়াছিল, পণ্ডিত মহাশয়েরা বড় গরীব, কিন্তু বড় উদার।

সে মনে মনে পণ্ডিত মহাশয়কে আদর্শ পুরুষ বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল।

১০

'হিরুদা, বাড়ী আছ হা ? ও হিরুদা, হিরুদা—'

অপূর্ব্ব ডাকিতেছিল, হিরুর উত্তর নাই। অন্য সময় মোক্ষদাসুন্দরী নিজেই তাহাকে ডাকিয়া লইতেন, কিন্তু আজ তাঁহারও সাড়া নাই। এমন সময় অপূর্ব্ব দেখিল— সম্মুখে অর্দ্ধগুণ্ঠনবতী শিউলি।

'হিরু কোথায় জানো ?'

অস্ফুটস্বরে শিউলি বলিল, 'তাঁরা দুজনেই বাঁড়ুয্যে বাড়ী গেছেন,—সেখানে একজন বুড়ার গঙ্গাযাত্রা হবে। মা এখনি ফিরবেন বোধ হয়।'

'তা সন্ধে হয়ে এল—আচ্ছা ভিতরেই একটু বসি।'

সে একেবারে বিনা বাক্যব্যয়ে দাওয়ায় গিয়া বসিল।

শিউলি অঙ্গনে দাঁড়াইয়া অঙ্গুলিপ্রান্তে বসনাঞ্চল জড়াইতে লাগিল।

'এস না, শিউলি, বসো। আচ্ছা, তোমার শ্বশুর এখন কেমন আছেন?'

'জানি না।'

'আচ্ছা, তোমার স্বামী হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেল কেন?'

'জানি না।'

'ধনঞ্জয়ের সঙ্গে তোমার কি কোন ঝগড়া হয়েছিল? সে তোমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করলে কেন?'

এবারও শিউলি কোন কথা কহিল না। অস্তোন্মুখ সূর্য্যের শেষ কিরণমালায় বড় বড় আমগাছগুলা সুবর্ণ-রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল। শিউলির মুখখানি বড় সুন্দর। তাহার জীবনের উপর দিয়া এমন একটা প্রলয়ের ঝড় বহিয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই অব্যাহত সৌন্দর্য্যে কোথাও তাহার একটু চিহ্নও নাই। দৃপ্তা অভিমানিনীর মূর্ত্তি—একটা বিরাট্ রহস্য যেন তাহাকে ঘেরিয়া একটা মূর্ত্তিমান্ মোহ সৃষ্টি করিয়াছে। অপূর্ব্ব তাহার দিকে নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল—নারী এত সুন্দর হয়! তাহাকে একবার দেখিলে আবার দেখিতে ইচ্ছা করে। তাহার চোখের দিকে চাহিলে সেই দৃষ্টির গভীরতায় ডুবিয়া মরিতে ইচ্ছা

হয়। অপূর্ব্ব বলিল্ল ‘দেখ, একটা কথা বলবো তোমায়। যেদিন তোমায় প্রথম দেখি, সেইদিনই তোমার কাছে আমার সব বাঁধা পড়েছে—’

শিউলি অবনত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। সে সুন্দর বাম হস্তখানি তুলিয়া দেখিতে লাগিল।

‘দেখ শিউলি, আমি তোমায় বিয়ে করতে রাজী আছি। আর এঁদেরও গলগ্রহ হয়ে থাকা তোমার উচিত নয়। তুমি তোমার নিজের অবস্থাই ভেবে দেখ না এক-বার। তোমার স্থান ত সমাজে হবে না। বরঞ্চ তোমায় যে আশ্রয় দেবে, সেও বিপদ ডেকে আনবে। এমন অব-স্থায় তোমারও ত একটা কর্ত্তব্য আছে। এঁরা তোমার যথেষ্ট করেছেন। মানুষ মানুষের কাছে যা আশা করতে পারে না, এঁরা তোমার জন্যে তাই করেছেন। অথচ এঁদের তাতে কিসের স্বার্থ? কিছুই না। আমি তোমায় যদি স্ত্রী বলে গ্রহণ করি, তাহলে হয়ত আমাদের জীবন সুখের হবে, এঁরাও নিষ্কৃতি পাবেন, সব গোলমাল ঢেকে যাবে। তুমি কথাটা একবার ভেবে দেখো, আমি অবশ্য আজই উত্তর চাইছিনি!’

এক নিঃশ্বাসে অপূর্ব্ব এতগুলি কথা বলিয়া গেল; কিন্তু শিউলি এখনও চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া। অনেক-

ক্ষণ পরে তাহার মুখে একটু হাসির ক্ষীণ রেখা ফুটিয়া উঠিল।

'না, আমি নিজেই ডুবেছি, আর কাউকে ডোবাবো না, জানবেন।'

'অত শীঘ্র আমি জবাব চাই না। তুমি জানো না বোধ হয়, সমাজের সঙ্গে আমার কোনই সম্বন্ধ নেই। সমাজের ভয় আমার নেই। আমি তোমায় চাই, শুধু তোমায় চাই। তোমায় যেদিন এ বাড়ীতে দেখেছি, সেদিনই আমার কি মনে হয়েছে জানো? মনে হলো যে একেই ত সারাজীবন ধরে খুঁজছিলাম—সৈধা! এই ত সেই। আমার জীবনের যে দিকটা দিয়ে আমি জগতের কাজে আসবো, সে দিকটা তোমাকে না পেলে সম্পূর্ণ হবে না! পাঁকের ভিতর থেকে পদ্মফুলের মত তুমি ফুটে উঠেছ—তোমার আগেকার জীবনের যেটা পাপ, আমার কাছে সেটা দেবতার আশীর্ব্বাদ বলে মনে হয়। আমি তোমাকেই চাই, শিউলি,—'

বলিয়া অপূর্ব্ব উঠিয়া দাঁড়াইল। ক্রমে তাহার কাছে সরিয়া আসিল। শিউলি তখনো নিশ্চলভাবে সেখানে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার ভয় নাই, লজ্জা নাই, অনু-শোচনা নাই। কিন্তু তবুও বোধ হয় সে যেন ভাবিতে

ভাবিতে অন্য রাজ্যে চলিয়া গেল। তাই অপূর্ব্ব কখন আসিয়া যে তাহার সুন্দর হাত দুখানি নিজের মুঠার ভিতর লইয়াছিল, তাহা সে অনুভবই করিতে পারে নাই। যখন পারিল, তখনও হাত সরাইয়া লইল না। 'শিউলি, আমি তোমায় ধর্ম্মপত্নীভাবেই চাই জেনো। আর জেনো—আমি ধনঞ্জয় নয়।'

এবার শিউলির মুখ ফুটিল। সে বলিল, 'তার নাম আর আমার কাছে করবেন না। সেই ত আমার এ অবস্থা করেছে। নারী যে পুরুষের খেলার পুতুল—পুরুষের খেলা সাঙ্গ হয়ে গেলে নারীকে সে চিরকালই দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসেছে। আপনি আবার আমায় বিয়ের কথা বলছেন? আমার কি আর বিয়ের বয়েস আছে?—কবে আমার বিয়ে হয়েছিল তা-ও মনে নেই। মেয়ে মানুষের কি আবার দুবার বিয়ে হয়?' বলিয়া সে হাসিল, সে হাসি বজ্রের মত কঠিন, আঁধারের মত রহস্যে ভরা।

'হয় এ বিয়ে। এ বিয়ে ত মন্ত্র পড়ে পুরুত ডেকে নয়। অগ্নিকে সাক্ষী করে এ বিয়ে হবে। তোমায় আমি আজীবন গ্রহণ করবো। কি দেখে তোমায় বিয়ে করতে চাইছি জানো? তোমার রূপ দেখে! ভালবাসা, প্রেম, দয়া—এ সবে আমার বিশ্বাস নেই। স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে,

স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসে—শুধু নিজের স্বার্থের জন্য! সে স্বার্থের মাত্রা পুরাপুরি পূর্ণ হয়ে গেলে আর কেউ কাউকে চায় না। তোমার রূপই আমায় টেনে এনেছে তোমার কাছে। শোনোনি, দুর্ভিক্ষের সময় ক্ষুধিত মাতা রোগজীর্ণ অনাহারী সন্তানকে বুকের কাছে টেনে এনে তার গলায় ছুরি বসিয়ে দেয়? তার নিজের দাবী যে সকলের চেয়ে মস্ত বড় দাবী। আমারও নিজের দাবী সকলের চেয়ে বড় দাবী। কিন্তু এতে প্রেম নেই, এ যে জ্বলন্ত দেহের জ্বলন্ত ক্ষুধা!'

'আমায় ছেড়ে দিন, অপূর্ব্ববাবু, আমায় ছেড়ে দিন। দেবতা এঁরা—এঁদের বাড়ী আর কলঙ্কিত করবো না।'

সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইয়া আসিতেছিল। অপূর্ব্ব শিউলির আরও কাছে আসিয়া বলিল, 'বল, আমার কথা ভেবে দেখবে? বল, আমায় প্রত্যাখ্যান করবে না? একবার বল, হাঁ—' বলিয়া সে শিউলির বল্লরীপ্রতিম বিকচ তনু আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইল। শিউলির সর্ব্বাঙ্গে একটা বিষের জ্বালা রি রি করিয়া উঠিল। এমন সময় মোক্ষদা প্রাঙ্গণে পা দিয়াই অন্যমনস্কভাবে ডাকিলেন, 'কোথায় গো মেয়ে!'

সম্মুখে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া

গেলেন। অপূর্ব্ব তাড়াতাড়ি আসিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বলিল, 'আহা, মেয়েটীর বড় কষ্ট। সব আমি আজ শুনলুম।'

'দেখ অপূর্ব্ব, আজকে আমি যা দেখলুম, তাতে আমার জগতের সম্বন্ধে সব ধারণা উল্টে গেছে। আমি জানতুম —একবার হঠাৎ পাপ করলে আবার তার ধর্ম্মভাব জেগে ওঠে; একবার পড়ে গেলে আর সে সহজে পড়ে না; একবার ভুল করলে চিরদিনই সে তার জন্য অনুতাপ করে। কিন্তু এ কি!—যাও, এখান থেকে তুমি চলে যাও, আমায় ছুঁয়ো না।'

কথাগুলির গাম্ভীর্য্য ও রৌদ্রভাব দেখিয়া অপূর্ব্ব রুদ্ধ-বীর্য্য সর্পের মত ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। শিউলির সমস্ত মুখের উপর লজ্জার একটা আবরণ নামিয়া পড়িল।

মোক্ষদা শুধু বলিলেন, 'ওঃ! মস্ত ভুল হয়ে গেছে! কাশীতে এসেও মানুষ এমন দানব হতে পারে! এখনো কি তোমার চোখ ফুটেনি বাছা? ছিঃ, ছিঃ, কি ভুল করে ফেলেছি!'

বলিয়া তিনি কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন। শিউলি অন্য মনে খিড়কীর পুকুরের দিকে চলিয়া গেল।

সেখানে দেখিল, বনপথ অতিক্রম করিয়া হিরণ্ময় নগ্ন-

পদে আসিতেছে। সে তাড়াতাড়ি গিয়া তাহার পদপ্রান্তে উপুড় হইয়া পড়িয়া বলিল, 'ওগো, আমায় রক্ষা কর! আমার চারিদিকে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। দিনে দিনে তোমায় দেবতার মত পূজা করছি, কিন্তু কিছুতেই যে ভুলতে পারছিনি! তোমাদের বাড়ীতে আমার মত পাপিষ্ঠার আর স্থান নেই, এখন আমি কোথায় যাবো বলে দাও!

শিউলির এই আকস্মিক ভাববৈষম্যে হিরণ্ময় বিস্মিত হইয়া গেল। সারাদিনের পর এই সে বাড়ী আসিতেছে— হঠাৎ পথের মাঝে এ কি অভিনয়! ব্যাপারটা তাহার ভাল লাগিল না। সে শান্ত সংযতস্বরে কহিল, 'এখানে কেন তুমি, চল, বাড়ীর ভিতর চল।'

'ওগো, বাড়ীর ভিতর যে আর আমার স্থান নেই! তোমার আসা পর্য্যন্ত আমার সময়, তা তুমি এসেছ, এইবার আমায় বলে দাও আমি কি করবো। এইবার আমায় বল—আমায় সেই বাগান থেকে তুলে এনেছিলে কেন? তখন বলিনি যে যেখানে আমি যাবো, পাপও সঙ্গে সঙ্গে যাবে? তখন বলিনি যে আমায় আশ্রয় দিলে সর্ব্বনাশকে আশ্রয় দেওয়া হবে? তখন বলিনি যে আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার দেহের ক্ষুধা, মনের গ্লানি, অন্তরের অভিশাপ সব যাবে? আমায় নিয়ে এসে আবার অপমান

করে তাড়িয়ে দিলে কেন ? ভিখারীকে ভিক্ষা দেবে না বল্লে তার যা কষ্ট হয়, তার চেয়ে বেশী কষ্ট হয়—তাকে ভিক্ষা দেবার লোভ দেখিয়ে এনে তাড়িয়ে দিলে। আমারও কি সেই দশা হয়নি ?'

'তুমি কি বলছ সব ? আমি ত কিছুই বুঝতে পারছিনি !'

শিউলি তখনো হিরুর ধূলিমাখা পাদুখানি সজোরে জড়াইয়া আছে। সে আলুথালুবেশে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিল, 'শুধু বলো যে তুমিও আমায় ভুল বুঝবে না ? তুমি—তুমি যদি ভুল বোঝো—'

তাহার বাক্য স্ফূর্তি হইল না। সে যেন আরও কত কি বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু তাহার মুখে ভাষা যোগাইল না। সে শুধু কাঁদিতে লাগিল।

হিরু এমন বিপদে কখনো পড়ে নাই। সে বলিল, 'তাহলে কি আমি এখানে এমনি আটকে থাকবো ? আমায় যেতে দেবে না ?'

তাহার স্বর বিরক্তিপূর্ণ দেখিয়া শিউলি পথ ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। হিরু বাড়ীর ভিতর ঢুকিতেই মাতা ডাকিলেন, 'হিরু, এখানে আয়। একটা বড় ভুল করে ফেলেছি।'

হিরু দেখিল, মাতা গম্ভীরমুখে রান্নাঘরের দাওয়ার

কাছে বসিয়া আছেন। তাঁহার মুখের বিরসভাব দেখিয়া হিরুর ভয় হইল। সে বলিল, 'কি ভুল হয়ে গেল, মা?'

'শিউলির আর এখানে থাকা হবে না। সে পাপ সঙ্গে করে এনেছে। তাকে আমি দেবতা করে তুলতে পারলুম না। কাঁটা গাছকে নন্দন-কাননে নিয়ে গেলেও তার কাঁটা বেরুবে। সে কথাটা আগে কেন বুঝিনি, হিরু—'

কথা শেষ হইতে না হইতেই শিউলি উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া আসিয়া মোক্ষদার পায়ের কাছে পড়িল। সে অশ্রুরুদ্ধস্বরে কহিল, 'হাঁ, মা, আমি বিষের গাছ। আমায় কেন বন থেকে তুলে এই পুণ্যের সংসারে ফেলেছিলে? আমার কণ্ঠে বিষ, আমার হৃদয়ে বিষ, আমার অঙ্গে বিষ। —আমি যে উগ্র বিষধর গো। কাল-সাপকে কেন দুধ-কলা দিয়ে পুষেছিলে, মা? আমায় ক্ষমা কর, ক্ষমা কর গো—আমার কোনও দোষ নেই। অপূর্ব্ববাবুই আমার কাছে এসেছিল—আমি ত তার কাছে যাইনি। সে আমার কে? আজ আমায় বিদায় দাও মা, আমি আপনাদের বড় জ্বালিয়েছি—'

হিরণ্ময় ব্যাপারটা কতক বুঝিতে পারিল। কিন্তু মাতার মুখের উপর কোনও উত্তর দিতে তার সাহস হইল না।

শিউলি এবার উঠিয়া দাঁড়াইল। জ্যৈষ্ঠমাসের আম্র

মুকুলের গন্ধে অন্ধকার পক্ষের প্রথম যামটা গভীরভাবে ভরিয়া উঠিয়াছে। শিউলি স্থিরকণ্ঠে বলিল, 'আমি আঁধারের মেয়ে, মা, আঁধার থেকে এসেছিলাম, আবার আঁধারের বুকেই ফিরে চললুম।' এই বলিয়া সে মোক্ষদাকে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

১১

পরদিন সকালে যদুনাথের পেয়াদা আসিয়া ডাকিল, 'দাদাবাবু বাড়ী আছেন গো ?'

হিরু তখন মধুসূদনের পূজা করিতেছিল। মোক্ষদা সুন্দরী অঙ্গনে বসিয়া দুগ্ধদোহন করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, 'কে ? অধরদাদা ? এসো না, দাদা, ভিতরে এসো।'

প্রৌঢ় অধর ঘোষের নীল উর্দ্দিপরা, বিরাট বক্ষ, অটুট শরীর, হাতে এক গাছা পাকা বাঁশের তৈলচিক্কণ লাঠী। সেই লাঠীর বলে সে কত গ্রাম্যযুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে। সে বলিল, 'রাজাবাবু দাদাবাবুকে একবার ডাকছেন।'

'বসো, বসো, তা দাদা, গিন্নিমা কেমন আছেন ?'

'তিনি ত উঠতে পারে না বিছানা থেকে। তেনার অসুখ ত কমবার নয়, দিদি।'

'তোমাদের দিদিমণি কেমন আছে ?'

'দিদিমণি ভাল আছে। তেনার বিয়ের লেগে বোঝা পড়া হচ্ছে। এই আষাঢ়েই বা হয়। তা ততদিন গিন্নিমা টেকলে হয়।'

'অধরদা, আগে আগে কতবার আমাদের বাড়ী আসতে, এখন আর দরকার না পড়লে আসো না। কেন গা ?'

'আর দিদি যে দিনকাল পড়েছেন! পাড়ায় যে ধূয়ো উঠেছে—ভট্টচায্যিবাড়ী যে যাবে, সে-ই একঘরে হবেন। কার বেবিশ্তে মেইয়াকে আপনি এনে রেখেছে,—তারির লেগে কোন্ ভরসায় বা আসি!'

'অধরদা, সে ত আর আমাদের বাড়ী নেই। সে যেখান থেকে এসেছিল, সেইখানেই আবার চলে গেছে। এখন ত আর আসতে বাধা নেই তোমার। বলো সকলকে, তারা আগে যেমন আসত তেমনি যেন আসে। বিধু সেখ, হেমা কলু, নবীন জেলে, পরাণে খামার—এরা সবাই কেমন আছে ?'

'পরাণ খামারের অবস্থা বড়ই খারাপ, দিদি। তার দুবেলা দুমোঠো চালের যোগাড় নেই। বুড়ো হয়ে গেছে। খাটতে পারে না। পাড়ায় বড় কষ্ট দিদি,

তবু এবার রাজাবাবু সব খাজনা রেহাই করে দিয়েছেন। সেদিন আমাদের দিদিমণি রাজাবাবুর সাথে গেরামে গিয়ে আমাদের কষ্ট দেখে হাপুসনয়নে কান্দতে লাগলো। সে ব্যাওরা যদি দেখতে গো—'

মোক্ষদার প্রসন্ন মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অধর ঘোষ বলিতে লাগিল, 'দিদিমণি এখন নিত্য গাড়ী করে পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে। আমাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খুব ভাব। সেদিন গিন্নিকে একখানা বস্তর দিয়েছে। দিদিমণির পা জড়িয়ে ধরে পাগলির কি কান্না গো!— এবার না কি দিদিমণি সকলকে বস্তর দেবে।'

এই সব কথাবার্তার অবসরে হিরণ্ময় প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইয়া উক্ত কথোপকথন সব শুনিয়াছিল। অধর তাহাকে দেখিতে পাইয়া কহিল, 'দাদাবাবু, আপনি একবার চলো কর্ত্তাবাবুর কাছে, কি বরাত আছে। আমি যাই, দিদি, বেলা হয়ে গেল। শিবু তেওরের নামে পরোয়ানা আছে সেই মাঝের পাড়ায়।'

অধর চলিয়া গেল। মোক্ষদা বলিলেন, 'শুনলি রে তোর শিষ্যের কাণ্ড? তাহা, মা-মরা মেয়ে, কেমন শান্ত মেয়েটী! অমন না হলে আর মেয়ে! শুনেও গর্ব্ব হয়!'

হিরুরও আনন্দ হইতেছিল। সেই কতদিন পূর্ব্বে একটী সুন্দর প্রভাতে সুধার সঙ্গে তাহার শেষ দেখা হইয়াছিল! তাহার পর প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আর একদিন—হাঁ, আর একদিন সন্ধ্যার সময় বাঁধের পথের কাছে দেখিয়াছিল। সে তখন গাড়ীতে বসিয়া ছিল। হিরু ছুটিয়া গিয়া যখন ক্ষিপ্ত ঘোড়ার রাশ ধরিল, তখন বালিকার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে কিন্তু গাড়ী হইতে নামে নাই। তাহার পরণে একখানি বহুমূল্য মান্দ্রাজী শাড়ী, আর কাণে দুটী মুক্তার দুল—এই সব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়া তাহাকে রাজরাণীর মতই দেখাইতেছিল। তাহার সেই লজ্জাপূর্ণ নীরবতাটুকু দেখিয়াই হিরুর মনে হইয়াছিল যে, দুই বৎসরে বালিকার মনের রাজ্যে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। সে অনেকখানি দেহে মনে বাড়িয়া গিয়াছে। তাহাকে দেখিলে ঠিক আগেকার লক্ষ্মীরাণী বলিয়া মনে হয় না। সে লক্ষ্মী যেন এ লক্ষ্মীতে মিশিয়া গিয়াছে। তার সঙ্গে কথা কহিতে হিরুর খুব ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু তাহার বড় লজ্জা করিয়াছিল। সে মুখ তুলিয়া সুধার দিকে চাহিতেই পারে নাই। তাহার নিজের কথা মনে করিয়া সে ভাবিত—এতদিনে সে কি করিতে

পারিয়াছে? তাহার মনে কত সংকল্প ছিল—গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করিবে, চিকিৎসালয় করিবে, সকলের মনে দেশপ্রীতি ও ধর্ম্মভাব জাগাইয়া তুলিবে,—সে সবের সে কি করিতে পারিয়াছে? সে অনেক-কিছুই করিতে পারিত, কিন্তু ভাগ্যবিপর্য্যয়ে তাহার কর্ম্মপ্রবাহের মাঝখানে শিউলি একটা ঝড়ের মত আসিয়া সব পরিবর্ত্তিত করিয়া দিল। সমাজের সঙ্গে তার যে নাড়ীর যোগ আছে, কেমন করিয়া সে তাহা বিচ্ছিন্ন করিবে? তাহার যৌবনোদ্ধত ব্যগ্র বাহু দুটী জগতে কোনই সুখ চায় না—কেবল এই লাঞ্ছিত, পতিত, অনাচারগ্রস্ত হিন্দুসমাজটীকে উদার প্রেমে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করিতে চায়।

আবার সে সুধার কথা ভাবিতে লাগিল। কেমন করিয়া তাহাকে ভুলিবে সে!—সেই বাঁকা ভ্রু, সেই গোলাপপ্রতিম বর্ণ, সেই মোহন চিবুক, সুন্দর হাত, সেই পরিচ্ছন্নবেশা চির হাস্যময়ী কিশোরী! তাহাকে ভোলা যায় না, তাহাকে ভুলিলে মর্ম্মের সব শিরাগুলি ভীষণ বেদনায় ঝন্ঝন্ করিয়া উঠে!

হিরু ভাবিতে লাগিল। মা ডাকিলেন, 'দাঁড়িয়ে অত ভাবছিস্ কিরে? তুই যে আজকাল ভারি ভাবুক হয়ে পড়েছিস! কেন রে, এত দুশ্চিন্তা কিসের?'

হিরু অপ্রস্তুত হইয়া ঘরের ভিতর গিয়া একখানি শুভ্র উত্তরীয় পাড়িয়া লইল। তার পর যদুনাথের বাড়ীর উদ্দেশে যাত্রা করিল।

গৌরবর্ণ নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ জমীদার মহাশয়ের আজ বড় গম্ভীর ভাব দেখিয়া কেহ কোনও কথা কহিতে সাহস করিতেছে না। সকলেই আপন মনে নিজ নিজ কাজ করিয়া যাইতেছে। যদুনাথের সমক্ষে একখানা সংস্কৃত পুস্তক খোলা রহিয়াছে। ইস্পাতের পুরানো চশমা-খানি দরজী-সাহেবের মত নাসিকাগ্রে লাগাইয়া তাকিয়ায় অর্দ্ধশয়ানভাবে তিনি একমনে সেখানি পড়িতেছেন। এখন আর সুধারাণী বাহির বাড়ীতে আসিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করে না। তিনি নিজে সংস্কৃত ভাষায় বেশ সুপণ্ডিত। দুঃখে শোকে তিনি গীতাখানি বুকে করিয়া শিবের মত বেশ নির্ব্বিকারভাবে থাকিতে পারেন। ধনী জমীদার হইয়া তিনি যেরূপ শান্তভাবে পারিবারিক দুঃখসমূহ জয় করিতে পারিয়াছেন, এমন বোধ হয় অন্য কেহ পারিত না।

বৃদ্ধ নবগোপাল আসিয়া সেলাম ঠুকিল। যদুনাথ একবার মুখ তুলিয়া চাহিলেন, অন্য দিনের মত 'কল্যাণ হোক্' আশীর্ব্বাদটী আর করিলেন না। নবগোপাল

ভাবিল—ব্যাপার কি! যদুনাথ অবনত মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কই, ধনঞ্জয় এলো না?'

'আজ্ঞে, কি বলেন—এসেছে বৈ কি। দেউড়ীতে ওর নাম গে—বসে আছে।'

'যাও, তাকে ডাকো।'

কিছুক্ষণ পরে নবগোপাল ধনঞ্জয়কে সঙ্গে লইয়া খাস-কামরায় আসিল। ধনঞ্জয়ের বাঁকা টেরি, আদ্ধির পাঞ্জাবী গায়ে, সেলিম-সু-পরা, হাতে আংটী, কাঁধে সিল্কের চাদর, পরণে মিহি ধুতি। বেশ সুদর্শন যুবা—মুখচোখের অবস্থা দেখিলে ভিতরকার অবস্থাও অনেকখানি বোঝা যায়। ধনঞ্জয় সভ্যতা জানে বলিয়া বোধ হইল না, কারণ সে যদুনাথকে প্রণাম করিল না, করজোড়ে দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল। যদুনাথ মুখ তুলিয়াই বলিলেন, 'এখানে বসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে। আর দেখ, নবগোপাল, তুমি এখন যেতে পার। নবগোপাল প্রমাদ গণিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে সরিয়া পড়িল। কি দুষ্ট গ্রহেই আজ সে পড়িয়াছে! কারণ সে জানিত, রাজাবাবুর ক্রোধে পড়িলে আর কোনও ক্রমে নিস্তার নাই।

যদুনাথ চশমা খুলিয়া ধনঞ্জয়ের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ

কটাক্ষে চাহিয়া বলিলেন, 'বিষ্ণু কামারের সঙ্গে তোমার কোনও বিষয়ে কোনও সম্বন্ধ ছিল?'

সহসা বজ্রাঘাত হইলেও সে এত বিস্মিত হইত না। সেই দুই বৎসর পূর্ব্বেকার ঘটনা!

'আজ্ঞে—না—এমন কি—'

'আমি ও-সব কিছুই শুনতে চাই না। আমি শুনতে চাই যে, তুমি তার কনিষ্ঠা পুত্রবধূর উপর কোনও অত্যাচার করেছিলে কি না। এ জবাবদিহি যদি সত্য হয়, তবে এই দণ্ডেই তোমায় এ গ্রাম ত্যাগ করে যেতে হবে।'

'অত্যাচার আমি কিছুই করিনি। তবে ওখানে যাতায়াত ছিল—তারা মেয়েটাকে বড় কষ্ট দিত—'

'ওঃ! কি দয়ার শরীর! দেখ বাবু, মোট কথা হচ্ছে এই যে, আমার জমীদারীর ভিতর ও-সব ধিঙ্গিপনা চল্‌বে না। ধিঙ্গিপনাকে আমি গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দেবো। তুমি এত বড় অত্যাচারী কুলাঙ্গার হয়েছ যে, পথে ঘাটে ভদ্রলোকের মেয়েদের যাবার উপায় নেই। মাতাল হয়ে চব্বিশ ঘণ্টা লোককে ব্যস্ত কর, তোমার জ্বালায় এখানে বাস করা দুর্ঘট হয়েছে। কার জমীদারীতে তোমার বাস, তা তুমি জানো?'—বলিতে বলিতে যদু-নাথের স্বর ক্রমশঃই উচ্চগ্রামে চড়িতে লাগিল। কিন্তু

ধনঞ্জয় ভয় পাইবার ছেলে নয়। সে শুধু বলিল, 'এই অপমানের জন্য আজ সকালে আমায় ডেকেছিলেন ?'

যদুনাথ মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন, 'নাঃ, তোমায় ডেকেছিলাম রসগোল্লার নিমন্ত্রণে! ভারি মানী তুমি! এই তেওয়ারি, ভজন সিং—'

বলিতে বলিতে দুজন অসুরের মত পালোয়ান দ্বার-প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল।

'ইস্‌কো আটক করনে চাহিয়ে। যাও, জল্‌দি লে যাও—।' তাহারা দুইজনে ধনঞ্জয়ের দুই হাত ধরিয়া বাহিরে লইয়া গেল।

ইতিমধ্যে হিরণ্ময় বারান্দায় আসিয়া এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। সে আসিয়া যদুনাথকে প্রণাম করিল।

'এসো, বাবা, এসো, তোমার সঙ্গে একটা গোপনীয় পরামর্শ আছে। চল, আমরা ভিতরের কামরায় যাই।'

একটা সুসজ্জিত কক্ষে যদুনাথ একখানি সোফায় বসিলেন ও হিরুকে আর এক খানিতে বসিতে বলিলেন। হিরু বসিলে যদুনাথ বলিলেন, 'দেখ হিরণ্ময়, সেই মেয়েটাকে তোমার বাড়ী হতে তাড়িয়ে দিতে হবে। ওকে ওখানে রাখলে সমাজের একটা কলঙ্ক—'

'সে আজ দুদিন হলো আমাদের বাড়ী থেকে চলে গেছে। তার সম্বন্ধে আর আমায় কোনও কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে তাঁকে আশ্রয় দিয়ে আমরা যে মস্ত ভুল করে ফেলেছিলাম, সেজন্য আপনার ক্ষমাভিক্ষা করছি।'

'চলে গেছে? কোথায় গেল?'

'তা ত জানি না। তবে সে সন্ধ্যার সময় আমাদের বলেই চলে গেছে। তার স্বভাব সংশোধনের বাইরে।'

'আচ্ছা, তার ব্যবস্থা আমি করবো। আর একটা প্রস্তাব আমি করতে চাই। দেখো, বেশ ভালো করে বুঝে দেখো, আর তোমার মাতাঠাকুরাণীকেও বুঝে দেখতে বলো। কারণ এ কথাটার উপরে তোমার সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে জেনো।'

'কি প্রস্তাব বলুন।'

'আমি সুধার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতে চাই। তুমি মনে করো না যে পাত্র পাচ্ছি না বলেই এই প্রস্তাব। তবে তোমার মত উপযুক্ত পাত্র পাচ্ছি না, এ কথাও ঠিক। গিন্নিও বিয়ের জন্য বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন!'

এত বড় একটা বিস্ময়কর প্রস্তাব হিক কল্পনাই করিতে পারিল না। নিবিড় উচ্ছ্বাসে তাহার বুকের রক্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সে ভাবিতেই পারিল না যে ইহা

কখনো সম্ভবপর হইতে পারে। ধীরবুদ্ধি সে,—এ পর্য্যন্ত কখনো কোনও বিষয়ে বিচলিত হয় নাই। কিন্তু আজ হইল—আজ সে জগতের কোনই কূল-কিনারা দেখিতে পাইল না। হিরু সবিনয়ে বলিল, 'দেখুন, আপনি যে প্রস্তাবটা করছেন, তাতে আমার নিজের দিক থেকে কোন কথাই বলবার নেই। কারণ, আমার জননী যা বলবেন, তা হতে আমার এক পা-ও নড়বার ক্ষমতা নেই। সুতরাং আমার মতে কথাটা তাঁর কাছেই পাড়া ভাল।'

'বেশ, তাই হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তোমার মতামতের একটা মূল্য আছে। মনে রেখো, লক্ষ্মীর যে স্বামী হবে, ভবিষ্যতে তাকেই আমার অবর্ত্তমানে এই বিশাল জমীদারীর ভার নিতে হবে।'

এই কথা শেষ করিয়া যদুনাথ চিন্তিত মনে উঠিলেন। আবার ফিরিয়া হিরুকে বলিলেন, 'তুমি এখন বাড়ী যাও, আমি সন্ধ্যার সময় তোমার মাতাঠাকুরাণীর সঙ্গে দেখা করবো।' হিরু চলিয়া গেল। বাহির বাড়ীতে আসিয়া দেখিল, দুইটী দরোয়ানের মধ্যবর্ত্তী হইয়া ধনঞ্জয় বসিয়া আছে। হিরুকে দেখিয়া সে একবার ক্ষুব্ধগর্ব্বে চাহিয়া দেখিল। কিছুক্ষণ পরে যদুনাথ আসিয়া বলিলেন, 'তোমার ব্যবহারে আজ আমি বড়ই অসন্তুষ্ট

হয়েছি। তোমার বাপের খাতিরে আজ তোমায় ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু জেনো, তোমার বিচার এখনো শেষ হয়নি।'

ধনঞ্জয় কহিল, 'আজই বিচার শেষ করতে পারতেন, কারণ এর পরে আর আমায় হয়ত খুঁজে পাবেন না, আমি ছোটতরফে গিয়ে বাস করবো।'

এ কথায় যদুনাথ বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ছোটতরফের জমীদার তাঁর চিরদিনের জ্ঞাতি। 'যাও —এখান থেকে দূর হয়ে যাও, আমি তোমার মুখ-দর্শন করতে চাইনি!'

ধনঞ্জয় সেখান হইতে বিতাড়িত হইয়া মদের দোকানে গিয়া উপস্থিত হইল। ঘোর মাতাল হইয়া সে যখন বাড়ী ফিরিল, তখন বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। যদুনাথের অর্থপুষ্ট হইয়া নবগোপাল দিব্য দ্বিতল গৃহ করিয়াছে। তাহার কন্যাগুলিরও সব বড় ঘরে বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ধনঞ্জয় একমাত্র পুত্র, তাহারও দুই বৎসর হইল বিবাহ হইয়াছে। তার পত্নী ঊষা দরিদ্রের মেয়ে—সুখের মুখ সে কখনো দেখিতে পায়নাই, কিন্তু প্রাণ ভরিয়া স্বামীকে ভাল-বাসিয়া সে নিজেকে ধন্য মনে করিত। বিপত্নীক শ্বশুর মহাশয়ের অক্লান্ত সেবায় সে তাহার দুঃখময়

জীবনটা ভরিয়া রাখিয়াছিল! দুর্বৃত্ত স্বামী মত্তপ, রাত্রে বাড়ী আসে না, নানারূপে অভদ্রভাবে নির্য্যাতন করে, কিন্তু তবুও উষার স্বামীভক্তি বজ্রের মত অটুট আছে। কত দুঃখের পর, কত তপস্যার পর সে এমন স্বামী পাইয়াছে! কিন্তু মূর্খ ধনঞ্জয় এ সব কিছুই গ্রাহ্য করিত না, সে নিজের ভাবাবেশেই দিনরাত্রি প্রমত্ত হইয়া থাকিত।

উপরে আসিয়া ধনঞ্জয় ডাকিল, 'উষা! উষা!' উষা শ্বশুরকে সবেমাত্র ঘুম পাড়াইয়া রন্ধনশালায় আসিয়াছিল। স্বামীর কণ্ঠস্বরে তাহার অবস্থা বুঝিয়া তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া সে উপরে আসিল। বাস্তবিক ধনঞ্জয় দিন কয়েক থিয়েটারের দলে ছিল।

'কি হয়েছে তোমার? আজও আবার সেই রকম অত্যাচার করেছ? নিজের শরীরকে তোমার এমন কষ্ট দিয়ে কি সুখ হয়, বল দেখি? দিনে দিনে অমন সোণার শরীরও ভেঙ্গে পড়ছে।'

খাটের উপর লম্বা হইয়া শুইয়া ধনঞ্জয় থিয়েটারী ঢং-এ বলিতে আরম্ভ করিল, 'উষি, পাপিয়সি! তুই কি বুঝিবি লীলা? পর্ব্বত-উদ্দেশে যবে বাহিরায় নদী, কার সাধ্য রোধে তার গতি?'

'চুপ করো, চুপ করো, মুখে হাতে একটু জল দাও,

বাবা বাইরের ঘরে ঘুমিয়েছেন, আবার সেদিনকার মত যদি টের পান। তুমি একটু ঠাণ্ডা হও।'

'ঠাণ্ডা হবো? আমার বক্ষে ভিসুভিয়সের অগ্নিজ্বালা জ্বলছে, আমার চোখে সর্ষে ফুল ফুটে উঠছে, আমার হৃদয় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে! আমি ভয় করবো? ভয় কাকে বলে? এই নির্জ্জন নিশীথে, করি যদি অঙ্গস্পর্শ তব, কি করিতে পারো তুমি?'

ঊষার হাসিও পাইল। সে কহিল, 'কর না, আমার অঙ্গস্পর্শ করে দেখো, আমি কি করতে পারি।'

'আমি তোমায় চাই না! চাই না, তোমায়, চাই না।' বলিয়া অসংবদ্ধ প্রলাপ বাক্য বকিতে বকিতে ধনঞ্জয় সজোরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। তাড়াতাড়িতে ঊষা ধনঞ্জয়ের পদাভিঘাতে ধরাশায়িনী হইয়া পড়িল। উঠিতে না উঠিতেই চাহিয়া দেখিল—ধনঞ্জয় যথেচ্ছ গালা-গালি করিতে করিতে বাহিরের বড় রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছে। ঊষা কুলবধূ, সে বাহিরে যাইতে পারিল না। কিন্তু তার বড় ইচ্ছা করিল, সে ছুটিয়া গিয়া তাহার জীবন-দেবতার পায়ের উপর গিয়া পড়ে ও তাহার পথরোধ করিয়া বলে, 'হে আমার চির-দয়িত! যদি যাইবে ত জন্মের মত আমায় দলিয়া যাও!'

১৩

শিউলি সন্ধ্যার সময় যখন হিরণ্ময়দের বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সে ভাবিতেই পারিল না যে কোথায় যাইবে। সুদীর্ঘ বিসর্পিত পান্থহীন অন্ধকারময় পথ, দুইদিকে বাঁশগাছ ও জঙ্গল, চারিদিক জনমানব পরিত্যক্ত,—শিউলি এমন অবস্থায় কোথায় যাইবে? আরও একদিন ত সে নিবিড় অরণ্যে আশ্রয় লইয়াছিল, গভীর রাত্রে সে যখন জ্ঞানহারা হইয়া পড়িল, তখন ত তাহার পাশে কেহই ছিল না। ভগবান্?—ভগবানে শিউলির আস্থা নাই, সৃষ্টিকর্ত্তা ত সৃষ্টির কার্য্য শেষ করিয়া দিব্য আরামে ত্রিদিব-রাজ্যের মসনদে বসিয়া বিশ্বের এই সংহার-লীলা সকৌতুকে দেখিতেছেন। তাঁহার প্রাণে ত দয়া নাই, মমতা নাই! নিষ্ঠুর, পাষাণ-প্রতিম দেবতা তিনি, নহিলে তাঁহার রাজ্যে এই অসামঞ্জস্য কেন? তাঁহার কি না ছিল? ধনী শ্বশুর, কন্দর্প-সুন্দর স্বামী, সুখের সংসার—এ সবই ত তাহার ছিল। ছিল ত আবার হারাইল কেন? তাহার অদৃষ্টের দোষ? কেন, সে কি দোষ করিয়াছিল? সেদিন ত সে বাঁচিয়াছিল, আজই বা কেন না

বাচিবে? কিন্তু আজ যে তাহার বুকে একটুও শক্তি নাই, মনে একটুও দৃঢ়তা নাই, চক্ষে আঁধার-কুহেলিকা ঘনাইয়া আসিতেছে,—আজ তার এ কি হইল?

একবার ভাবিল, যে দিকে দুইচক্ষু যায় সেইদিকেই সে চলিয়া যাইবে। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই দেখিল যে, সে পথটা নিবিড় অরণ্যে গিয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আবার পিছনে ছুটিয়া যাইবে? সে দিকে ত হিরণ্ময়দের বাড়ী। সে বাড়ীর সহিত সে সকল সম্পর্ক ত চুকাইয়া দিয়া আসিয়াছে,—আর সেদিকে সে যাইবে না। যে পথ সে একবার অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, আর সে পথে সে যাইবে না। জীবনের যে সৌন্দর্য্য, যে সুধা—তাহা সে আকণ্ঠ পান করিবে। তাহার যে জগতের ক্ষুধা এখনও মিটে নাই, ভগবান যদি সব কাড়িয়া লইলেন ত এই সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার জ্বালা তাহার অন্তরে এখনও জ্বালাইয়া রাখিলেন কেন? এই সব ভাবিতে ভাবিতে সে একটা প্রকাণ্ড পুষ্করিণী তটে আসিয়া দাঁড়াইল। আকাশের অসংখ্য তারকা সেই নিস্তরঙ্গ সলিলবক্ষে সুবর্ণকোরকের মত প্রতিভাত হইতেছে। যেন অনেকদূর হইতে একটা অস্ফুট কাতরধ্বনি আসিতে লাগিল। তাহা বাতাসের শব্দ। শিউলি সেই বাঁধা ঘাটে একটু বসিল। কতক্ষণ করতলে কপোল সংন্যস্ত করিয়া হিজিবিজি

কি ভাবিতে লাগিল। তখনো রাত্রি বেশী হয় নাই। ঘাটের উপর বসিয়া থাকা নিরাপদ নয়, মনে করিয়া শিউলি আবার পাশের একটা বড় রাস্তা ধরিয়া বরাবর চলিতে লাগিল। সে একবস্ত্রেই চলিয়া আসিয়াছে, হিরণ্ময়ের বাড়ীতে যে স্বর্গের শান্তি ও সুখ ছিল, তাহার ভিতর যেন তাহার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। আজ এই বাঁধন-হারা মুক্তির সুখে তাহার প্রাণ আবার এক দানবীয় আনন্দে ভরিয়া উঠিল। মানুষের মনে যে দানবীয় ভাব আছে, তাহা এইরূপে সদাসর্ব্বদাই মনের বাতায়ন দিয়া উঁকিঝুঁকি মারিয়া যায়। দুর্ব্বলহৃদয় যারা, তারা সেই ভাবের কাছে আত্মবিক্রয় করে। সবল যারা, তারা প্রচণ্ড শক্তিবলে সেই ভাবটীকে মনের ভিতর পদদলিত করিয়া ফেলে। শিউলি যে স্রোতের ফুল,—সে তরঙ্গের অভিঘাতে তাড়িত হইয়া সংসারের ঘাটে ঘাটে ফিরিতেছে, তাহার যে দাঁড়াইবার সামর্থ্যই নাই!

অনেকদূর সে অগ্রসর হইয়া চলিল. পথের দুধারে বড় বড় বাড়ী, ক্রমে সে বুঝিল, জমীদারবাড়ীর পথেই সে চলিয়াছে। ঐ না অদূরে তিনতলা গেরুয়া রংএর প্রকাণ্ড বাড়ীখানা? ঐ না নহবৎখানা? হাঁ, ঐ ত, ঐ বাড়ীর মালিকই ত এক দিন তাহার শ্বশুরকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছিল।

আবার কোন্ মুখে সে ও-বাড়ীর দুয়ারে গিয়া ভিখারিণীর বেশে দাঁড়াইবে? আলোচনা করিতে করিতে সে একেবারে যদুনাথের বাড়ীর দেউড়ীতে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রকাণ্ড পুরী নিস্তব্ধ, বাহিরে আলো জ্বলিতেছে বটে কিন্তু গোটাকয়েক দরোয়ান ছাড়া আর কেহই সেখানে নাই। কিন্তু আর যে সে চলিতে পারে না! পথচলা ত তাহার কোনকালেই অভ্যাস নাই, গভীর দুঃখের মধ্যে পড়িয়াও সে কখনো দুঃখকে বরণ করিয়া লইতে পারে নাই। ইতিমধ্যে অজ্ঞাতসারে সে প্রায় দুই ক্রোশ রাস্তা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আর যে তার পা উঠে না! ক্রমে ক্রমে সে অনুজ্জ্বল আলোকে পুরোভাগেই দেখিল, একখানা আটচালা ঘরের পাশে একটা বেঞ্চি রহিয়াছে। সে সেইখানেই গিয়া বসিল। সেই আটচালা ঘরখানি প্রত্যহ দিবাভাগে দূরগ্রামাগত যদুনাথের প্রজাবৃন্দের দ্বারা ব্যবহৃত হইত। কিয়ৎক্ষণ বসিয়া বসিয়া তাহার চক্ষু তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। সে আর বসিতে পারিল না, অঞ্চল বিছাইয়া সেই বেঞ্চিখানির উপর শুইয়া পড়িল। সে এখন নিশ্চিন্ত—জগতে তার ভাবনার বিষয় কিছুই নাই, তাই শুইবামাত্র সে ঘুমাইয়া পড়িল।

প্রভাতের প্রথম কিরণ-সম্পাতে তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া

গেল। সে একেবারে চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিল। অন্য দিন হইলে সে এতক্ষণ হিরণ্ময়ের পূজার জন্য পুষ্পচয়ন করিয়া আনিত। গতকল্যও আনিয়াছে। পথে ইতিমধ্যেই লোক চলাচল আরম্ভ হইয়াছে। অদূরে দাওয়ার উপর কতকগুলি গ্রাম্য কৃষক বসিয়া আছে দেখিল। তাহারা যদুনাথের প্রজা, কি আরজি করিতে আসিয়াছে। তাহাদের চিরকালের ব্যবহৃত দাওয়াটীতে এক অপরূপ রূপসী চারিদিক আলো করিয়া নিদ্রিত রহিয়াছে দেখিয়া তাহারা আর সেখানে উঠিতে সাহস করে নাই। খরসানের আগুনে তাহারা তামাকু সেবন করিতেছিল। একজন চুপি চুপি বলিল, 'হা মোর কপাল, মুই ভেবেছিনু দেবকন্যে! কি বেওরা গো!' আর একজন বলিল, 'হাঁ রে যদো, তোর কি বিবেচনা নেই? কোন্ বামনী পথভুলে এসে পড়েছে।' আর একজন বলিল, 'বোধ হয় কোনো পেরজা হবে। আচ্ছা, রাজাবাবুকে খবর দিই।' সকলে এ প্রস্তাবের অনুমোদন করিল। একজন অতিমাত্রায় কুতূহলী হইয়া দেউড়ী পার হইয়া যদুনাথের নিকট গেল। সে গিয়া বলিল, 'রাজাবাবু, বললে না পিত্যয় যাবে, তোমার আটচালার দাওয়ায় একজন দেবকন্যে নিদ্ যাইছে। মোরা চাষাভূষো সেথাকে উঠতে সাহস করিকনি, তোমার সাথি

বোধ করি কোনো বুঝাপড়ার লেগে আইছেন।' যদুনাথ অধরকে পাঠাইয়া দিলেন। অধর আসিয়া শিউলিকে দেখিল। তাহাকে বলিল. 'ওগো ভালমানুষের মেইয়া, কর্ত্তাবাবু আপনাকে ডাকতিছে। মোর সাথে এসো।' শিউলি এই সব ব্যাপার তখনো ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই। প্রতি প্রভাতে পরিস্নাত হিরণ্ময়ের সেই সূর্য্যস্তবটী শুনিতে শুনিতে তার ঘুম ভাঙ্গিত—

'জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

কার কাছে যাইতে হইবে, কিসের জন্য যাইতে হইবে, তাহাও সে ভাল করিয়া বুঝিল না। শুধু এই বুঝিল যে, যাহার ঘরের দাওয়ায় সে নিশা যাপন করিয়াছে, তাহারই কাছে বোধ হয় কোনও জবাবদিহি করিতে হইবে। বেশ, শিউলি তাতেও ভয় করে না। কেন, জগতে কি কেহ তাহার কোন উপকার করিয়াছে? তবে ভয় কাহাকে? শিউলি অধরকে বলিল, 'আচ্ছা, চল, কোথায় নিয়ে যাবে।' সে উঠিয়া বেশবাস সুসংবদ্ধ করিয়া গুণ্ঠনবতী হইয়া চলিল। অধর যখন ক্রমে তাহাকে যদুনাথের দেউড়ী পার করাইয়া উপরের তলায় লইয়া যাইতেছে, তখন তাহার চমক ভাঙ্গিল। সে ক্রুদ্ধা সিংহিনীর মত ঘাড় বাঁকাইয়া অধরকে বলিল,

'এ কি, এ আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? এখানে আমার কি দরকার? এখানে আমি যাবো না।' এই বলিয়া সে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইল। অধর তাহাকে বুঝাইয়া বলিল, 'না গো মেয়ে, তোমার কোনও ভয় নেই, আইস মোর সাথে।' কি ভাবিয়া শিউলি আবার চলিল। সুপ্রশস্ত বারান্দা পার হইয়া সে একটী সুসজ্জিত কক্ষে উপস্থিত হইল। কিন্তু যদুনাথ তখন সে ঘরে ছিলেন না। সুধারাণী কি প্রয়োজনে সে ঘরে আসিয়াছিল। সহসা অধরের পশ্চাদ্‌বর্ত্তিনী এই সুন্দরী তরুণীকে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে বিস্মিত হইল। সুধা জিজ্ঞাসা করিল, 'এ কে, দাদু?' অধর তাহাকে আবাল্য মানুষ করিয়াছে বলিয়া সে তাহাকে 'দাদু' বলিয়া ডাকিত।

অ। দিদিমণি, রাজাবাবু এনার সাথে দেখা করবার লেগে ডেকেছেন।

সু। তুমি কে গা?

সহসা এ প্রশ্নের জন্য শিউলি মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সে একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, 'তুমি আমায় চিনবে না।'

সু। তুমি কোথা থেকে আসছো গা?

শি। হিরণ্ময়দের বাড়ী থেকে আসছি।

সু। হিরণ্ময়? পণ্ডিত মশাই? ওঃ, বুঝেছি।

তুমিই সেই গরীবের মেয়ে! তোমার জন্য পণ্ডিত মশাইকে জাতে ঠেলা করে রেখেছিল? কেন গা, তুমি কি করেছিলে?

সুধার এই সরল প্রশ্নে শিউলির আহত অভিমান মাথা তুলিয়া জাগিল। সে সদর্পে কহিল, 'আমি তাঁর আশ্রয় ত চাইনি, তিনিই জোর করে' আমায় নিয়ে গিছলেন। নিজের দুঃখ নিজেই ডেকে এনেছিলেন বলে' তিনি সমাজে পতিত ছিলেন।'

সুধা তাহার নিজের প্রশ্নেই নিজে যেন ছোট হইয়া গেল। কিন্তু এই সুন্দরী নারীটির সঙ্গে তাহার বন্ধুতা করিতে ইচ্ছা হইল। শিউলির ভাসা-ভাসা আয়ত কৃষ্ণতার চক্ষুদুটী যেন কোন্ নিপুণ পটুয়া তুলি দিয়া আঁকিয়া দিয়াছে। সে কহিল, 'কিছু মনে করো না ভাই, আমি বুঝতে পারি নি। দাদামশাই-এর সঙ্গে তোমার কি দরকার আছে, ভাই?' এই সহজ সরল প্রশ্নে শিউলির প্রাণ যেন গলিয়া গেল। বন্ধুত্বের সম্পর্কটা তার কাছে খুবই নূতন। সে কহিল, 'আমার একটা নালিশ আছে তোমার দাদামশাই-এর কাছে।'

সুধা শিউলির রূপে মুগ্ধ হইয়াছিল, শিউলিও মুগ্ধের মত সুধার দিকে চাহিয়াছিল। সহসা অধরকে সুধা

কহিল, 'তুমি যাও' ত, দাদু, দাদামশাই এলে এঁকে আমি দেখা করিয়ে দেবো'খন।'

অধর চলিয়া গেলে শিউলির হাতখানি ধরিয়া সুধা কহিল, 'তোমার কি হয়েছে ভাই, আমায় বলতে হবে। তুমি কার সঙ্গে আমাদের বাড়ী এলে? পণ্ডিত মশাই-এর সঙ্গে? পণ্ডিত মশাই কোথায়? পণ্ডিত মশাই-এর কাছে তুমি পড়তে না কি? তিনি আমাকেও পড়াতেন। কি সুন্দর সংস্কৃত স্তোত্র তিনি গান করতে পারেন। তুমি বোধ হয় শুনেছ। খুব ভাল, নয়? আর এক দিন তিনি আমাদের দুরন্ত ঘোড়াটার রাশ ধরে' আমাকে আর দাদা-মশাইকে মরণের মুখ থেকে বাঁচিয়েছিলেন। তিনি সে দিন না থাকলে আমরা দাদা-নাতনী নিশ্চয়ই মরতুম।'

সুধা অজস্র বকিয়া যাইতেছিল। শিউলি ভাবিল, বেশ মেয়েটী ত! এ এখনও সংসারের কিছুই জানে না। শিউলি ইহাকে সে সব কথা বলিতে পারিবে না। বলিলেও সে হয় ত বুঝিবে না। সে বেশ বুঝিয়াছিল. হিরণ্ময়ের প্রতি মেয়েটীর একটা গভীর শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাব আছে। এখন সে হিরণ্ময়ের শত্রু। সে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে অথবা তাহার মনের গোপন কথাটী বুঝিয়াও বুঝিতে চায় নাই, তাই সে সর্ব্বদাই শিউলিকে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গিয়াছে।

'তোমার নামটী কি ভাই ?'

'আমার নাম সুধারাণী ! তোমার ?'

'আমার নাম শেফালিকা—আমায় শিউলি বলেই সবাই ডাকে।'

ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে করিতে যদুনাথের কর্ণে 'শিউলি' নামটা গেল। তিনি মেয়েটার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমিই হিরুদের বাড়ী থাকতে, মা ? সেখান থেকে চলে এলে কেন ? তাঁরা যে স্বর্গের দেবতা। তুমি কায়স্থ, তাঁরা ব্রাহ্মণ। চিরজীবন তাঁদের সেবা করলে তোমার সব পাপের খণ্ডন হয়ে যেত। কাজটা ত ভাল করনি। আমি তোমার কথা সব জানি। আমার বাড়ীতে আমার এই দুষ্টু নাতনিটীর সঙ্গে থাকতে রাজী আছ ?'

এই গৌরবর্ণ বৃদ্ধটী তাহার শ্বশুরের সর্ব্বস্ব নিয়াছিলেন ! কই, তাঁহার ব্যবহারে ত তাঁহাকে কুৎসিত লোক বলিয়া মনে হয় না ! কিন্তু তিনি তাহাকে আবার নিজ সংসারে আশ্রয় দিতে চাহিতেছেন কেন ? সে যে বিষধর সর্পী,—যেখানে যাইবে, সেইখানেই বিষ উদ্‌গীরণ করিতে করিতে যাইবে। কি ভাবিয়া বলিল, 'আপনি রাজা, আপনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, আমার একটী ব্যবস্থা করে দিন।' এই বলিয়া চতুরা নারী যদুনাথের পায়ের তলায় আশ্রয়

লইল। যদুনাথ হাসিয়া বলিলেন, 'যাও, দিদি, আজ থেকে তোর একটী বন্ধু দিলুম।' সুধা হাসিতে হাসিতে শিউলির আঁচল ধরিয়া টানিতে টানিতে গৃহান্তরে লইয়া গেল।

এক দিন যদুনাথ এই কুলটাকে আশ্রয় দিবার জন্য হিরণ্ময়কে বিষম তিরস্কার করিয়াছিলেন। আজ আবার কি বলিয়া তিনিই তাহাকে পরিবারভুক্ত করিয়া লইলেন! তাঁহার সারা প্রাণ উদ্ধত বিদ্রোহীর মত চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—কুলটা! কুলটা! কিন্তু নিজ গোপন অভিপ্রায় সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছেন ভাবিয়া তিনি মনে মনে হাসিলেন।

১৪

অপূর্ব্ব সেদিন এইরূপে হিরুদের বাড়ীতে লাঞ্ছিত হইয়া আর সেখানে যাইতে সাহস করে নাই। এক দিন সে হিরুকে পথে দেখিয়া জোর করিয়া নিজেদের বাড়ী লইয়া গেল। আজকাল সে বোনের বাড়ী ত্যাগ করিয়া অন্য একটা ভাড়া বাড়ীতে থাকে।

তখন মধ্যাহ্ন। হিরু আহারাদি সমাপন করিয়া পাড়ায় পাড়ায় তার অনুগত ছাত্রদের সন্ধান লইয়া ফিরিতেছিল।

ইতিমধ্যে পাড়ায় শিউলির কাহিনীটি প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। হিরণ্ময়ের মাতা বিশেষ সুবুদ্ধি করিয়াই যে তাহাকে গৃহ হইতে দূরীভূত করিয়া দিয়াছেন, তাহা সকলেই একবাক্যে বলিল। যাহারা হিরুর অনুগ্রহপ্রার্থী অথচ সমাজভয়ে কোনও বিষয়ে তাহার সঙ্গে আদান প্রদান করিতে পারিত না, তাহারা এবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। কিন্তু যখন গ্রামবাসীরা শুনিল যে, এই সমাজ বিচ্যুতা রমণীকে জমীদার যদুনাথ সাদরে নিজগৃহে স্থান দিয়াছেন, তখন তাহাদের আর সমালোচনা করিবারও সামর্থ্য রহিল না। যদুনাথ নিরীহ জমীদার বটে, কিন্তু নিরীহ বলিয়াই তাঁহাকে আরও বেশী ভয় করিয়া চলিতে হয়। হিরুও শুনিয়াছিল, কিন্তু এই ব্যাপারটাকে সে এতই তুচ্ছ মনে করিত, যে, সে ইহা একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিল। আজ অপূর্ব্ব যখন তাহার চাদর ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল, তখন আর একবার শিউলির কথা তাহার মনে পড়িল।

'আচ্ছা, হিরুদা, আমি সেদিন এমন কি অন্যায় করে ছিলুম যে মা আমায় তাড়িয়ে দিলেন? সত্যি, হিরুদা, আমার কোন দোষ ছিল না। সেদিন তোমার দেখা না পেয়ে শিউলির সঙ্গে গল্প করছিলুম। কথায় কথায় সে

আমাকে বিয়ে করতে রাজী কি না তা-ও জিজ্ঞাসা করি। এমন সময় মা আমাদের তুজনকে দেখে খুব রেগে গিছ্‌লেন। বল, হিরুদা, এতে আমার কি দোষ আছে ?'

হি। মার কথার সমালোচনা করবার আমার অধিকার নেই। তবে এই পর্য্যন্ত বলতে পারি, আমাদের বাড়ীতে বসে ঐ লঘুচরিত্রা নারীটির সঙ্গে তোমার ও বিষয়ে কোন রূপ কথাবার্ত্তা না তোলাই ভাল ছিল। একে তার চপল মন, তায় তার জীবনের সঙ্গে একটা কলঙ্ক-কাহিনী বিজড়িত রয়েছে,—এমন অবস্থায় তার সঙ্গে তোমার কোন কথা কওয়া উচিত হয়নি। রাগ করো না দাদা!

অ।—না, না, রাগ করবো কেন? তা এখন ত সে তোমাদের বাড়ী ছেড়ে জমীদার-দুর্গে আশ্রয় নিয়েছে। আমি এই দুর্গ জয় করে দুর্গেশনন্দিনীকে পেতে চাই। আমি তাকে চাই হিরুদা,—তাকে পাবার জন্য আমি জীবনপণ করেছি। সমাজের তার উপর ত কোনো দাবী-দাওয়া নাই—সমাজ তাকে দূরে ফেলে দিয়েছে। আমি তাকে কুড়িয়ে নোবো।

হি।—কিন্তু এবার রাজাবাবুর সঙ্গে লড়তে হবে। জমীদারের সঙ্গে পারবে ?

অ।—কেন পারবো না? জমীদার কে? কিছু বেশী

টাকা থাকলে ও লোকবল থাকলেই লোকে তাকে জমীদার বলে। শিউলির উপর তাঁর কোনই অধিকার নেই।

হি।—কিন্তু জোর করবে কেমন করে?

অ।—আচ্ছা ভেবে দেখি, কি করতে পারি।

এই সব কথাবার্ত্তার পর হিরু বৈকালে বাড়ী আসিল। কিছুক্ষণ পরেই যদুনাথের বিরাট্ অশ্বযানখানি তাহার বাড়ীর চত্বরে আসিয়া দাঁড়াইল। ইতিপূর্ব্বেই হিরু বাড়ী আসিয়া মোক্ষদাকে সব কথা বলিয়াছিল।

'গিন্নি কই গো বাবাজী' বলিতে বলিতে জমীদার মহাশয় ঘরের ভিতর ঢুকিলেন। মোক্ষদা কক্ষের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলেন। যদুনাথ বলিলেন, 'আজ আপনার কাছে আমার একটী প্রস্তাব আছে।'

মো।—আমি সব কথা শুনেছি হিরুর কাছে। আমার এ বিবাহে সম্পূর্ণ মত আছে, কিন্তু একটা কড়ার আছে।

য।—কি অনুমতি করুন।

মো।—হিরু আপনার ঘরজামাই হয়ে থাকবে না, আর আপনার মেয়েকেও এসে আমার এই কাকের-পা-গলে-যাওয়া খড়ো ঘরে থাকতে হবে।

য।—এ সব না ভেবে কি আর আমি প্রস্তাব করেছি আপনার কাছে!

ভবিষ্যতের সুখময় চিত্রটা মোক্ষদার দুঃখময় জীবনের অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুতের মত চিকমিক করিয়া গেল। সুধার মত লক্ষ্মী বউ তিনি কি আর পাইবেন! এই ভবিষ্যৎ সুখের আশায় তাঁহার অন্তর ইতিমধ্যেই ভরিয়া উঠিয়াছে। যদুনাথ বলিলেন, 'তা'হলে এই ২৮শে বৈশাখ ভাল দিন আছে। আমি সেই দিনই শুভ কার্য্যটা সেরে ফেলতে চাই। আপনি কি বলেন?'

মো।— আমি ত মত দিয়েছি আমার আর আপত্তি কি?

য।—বেশ, তা'হলে আজ উঠি।

যদুনাথ বাহির হইয়া যাইতেছেন, এমন সময় পূর্ব্ববৎ মৃদুকণ্ঠে ঘোমটার ভিতর হইতে মোক্ষদা বলিলেন, 'একটা কথা জিগ্যেস করবো মনে করিছিলুম।'

যদুনাথ ফিরিয়া বলিলেন, 'কি বলুন।'

মো।—আপনি সেই পতিতা মেয়েটাকে আপনার ঘরে যে বড় আশ্রয় দিয়েছেন? অথচ এখানে যখন ছিল, তখন আপনিই আমাদের জাতিচ্যুত করেছিলেন। এ রহস্যটা আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না!

যদুনাথ হাসিয়া কহিলেন, 'বেয়ান ঠাকরুণ, সত্যিই মেয়েটাকে দেখলে বড় দুঃখ হয়। ওর একটা ব্যবস্থা করে দোবো মনে করেছি।'

তাহারাও ত শিউলির দুঃখে সহানুভূতি করিয়া তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিল! তবে তফাৎটা কিসে হইল? মোক্ষদা ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু তিনি আর কোনও কথা কহিলেন না, শুধু ভাবিলেন—তাঁহার ভাবী বেহাই মহাশয় নিজের জালেই নিজে ধরা পড়িয়াছেন।

১৫

ছোট তরফের জমীদার অজয়চন্দ্র প্রায় দুই বৎসর হইল পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা পাইয়াছিলেন। তাঁহার জমীদারী যদুনাথের অপেক্ষা ছোট নহে তিনি মস্ত বড় শিকারী ছিলেন, প্রায়ই দলবল লইয়া হিমালয়ের প্রান্তদেশে ও নেপালে শিকারে বাহির হইতেন। তাঁহার এই বিষম শিকার-প্রবণতার জন্য অনেক প্রজা তাঁহার জমীদারী পরিত্যাগ করিয়া যদুনাথের তরফে উঠিয়া গিয়াছিল বলিয়া, দুই জমীদারের মধ্যে মোটেই সদ্ভাব ছিল না। বৎসরের মধ্যে সাত আট মাস তিনি দেশ-বিদেশে কাটাইয়া আসিতেন, সেজন্য নিজে জমীদারী সংক্রান্ত কোন কাজ সর্ব্বদা দেখিতে পারিতেন না। জমীদারীর সব ভার এক অর্থপিশাচ নায়েবের উপর ছিল। এই নায়েবটী কেমন করিয়া পরের পয়সায় বড়

মানুষ হওয়া যায়, তাহা বেশ ভাল করিয়াই জানিত। সে নানারূপে প্রজাগণকে পীড়ন করিত, নির্ভয়ে তাহাদের ঘরে আগুন লাগাইয়া দিত ; কারণ, সে জানিত যে তাহাকে অপরের কাছে জবাবদিহি করিতে হইবে না।

অজয়চন্দ্র মৃত্যুর বহু পূর্ব্বেই বিপত্নীক হইয়াছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁহার একমাত্র পুত্র লালাসাহেবই জমীদারীর তত্ত্বাবধান করিত। লালাসাহেব নামটা শিখ ধরণের ; কারণ, বিশ বৎসর পূর্ব্বে অজয়চন্দ্র যখন সস্ত্রীক পাঞ্জাবে বেড়াইতে যান, তখন লালাসাহেবের পাঞ্জাবেই জন্ম হইয়াছিল। লালাসাহেবের প্রাইভেট টিউটার ছিল, পণ্ডিত ছিল, কিন্তু সে স্নেহময় পিতার সঙ্গেই বেশীর ভাগ সময় বাহিরে বাহিরে কাটাইত। লালাসাহেবকে দেখিতে ঠিক সাহেব বাচ্চারই মত, কিন্তু তেমন কটা চোখ ও কটা চুল নয়। অজয়চন্দ্রের পত্নী বিখ্যাত সুন্দরী ছিলেন। লালাসাহেব নির্ভীক উৎসাহশীল যুবক,—সে তীর ছুড়িতে পারিত, গান গাহিতে পারিত, লক্ষ্য স্থির করিয়া বন্দুক ছুঁড়িতে পারিত, তাই সকলে বলিত—একদিন সে-ও পিতার মত মস্ত শিকারী হইতে পারিবে। শাস্ত্রবিদ্যার অপেক্ষা সে শস্ত্রবিদ্যাটাই বিশেষ আপনার করিয়া লইতে পারিয়াছে।

নিরানন্দ গৃহে ফিরিতে অজয়চন্দ্রের মন উঠিল না। সেই বিশাল অট্টালিকার কক্ষে কক্ষে তাঁহার মৃতা স্ত্রী নীহারিকার স্মৃতি বিদ্যমান আছে। লোকান্তরিতা স্ত্রীর বিরহশোকটা তাঁর মনে শেলের মত বিঁধিয়া ছিল। প্রায় কুড়ি বৎসরের বিবাহিত জীবনের মধ্যে সে যে একদিনও তাঁর কাছ ছাড়া হয় নাই! তার নাম চিরস্থায়ী করিবার জন্য অজয়চন্দ্র প্রায় ত্রিশবিঘা জমির উপর সন্ন্যাসিগণের বিশ্রামার্থ "নীহারিকা-মন্দির" নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

এবার দীর্ঘপ্রবাস হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্বদেশের লতাপাতা, ফলফুল, পাখীর ডাক, বাতাসের সন্ সন্ শব্দ লালাসাহেবের বড় ভাল লাগিল। সে বড় নিরীহ যুবক,—কাহারও সঙ্গে মিশিবার সুযোগ পাইত না বলিয়া সে তাহার বন্দুক, পিস্তল, লাঠী, তীর, ধনুক লইয়াই থাকিত। তাহার সম্প্রতি আর একটী খেয়াল চাপিয়াছে, সেটী ফটো তোলা। গ্রীষ্মের অপরাহ্ণে সে একটী ক্ষুদ্র ক্যামেরা লইয়া পল্লীর সরল অনাবিল সৌন্দর্য্যটী ফটো প্লেটে তুলিবার জন্য বাহির হইয়াছে। সম্মুখে প্রকাণ্ড একটা মাঠ,—তাহার আর কূলকিনারা পাওয়া যায় না। সেই মাঠের ওপারে শীর্ণকায়া নদীটি যেন দীর্ঘ একখণ্ড শুভ্র উপবীতের

মত সূর্য্যালোকে চিকমিক করিতেছে। নদীটা যদুনাথ ও অজয়চন্দ্রের জমির এক দিকের সীমানা।

চারিদিকের এই শান্ত মাধুর্য্য ও একটা গভীর তৃপ্তিময় সৌন্দর্য্য দেখিয়া লালাসাহেব মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। অনেক-ক্ষণ পরে সে ভৈরবীর কূলে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘাটে একখানা শালতি বাঁধা রহিয়াছে, তাহা খড়ে বোঝাই করা। নদীতে এখন ভাঁটা পড়িয়াছে, হাঁটিয়াই স্বচ্ছন্দে পার হওয়া যায়। অজ্ঞাত ও অপ্রত্যাশিত বিপদের মধ্যে দিশেহারা হইয়া যাইতে লালাসাহেবের খুব ভাল লাগিত। ইহা শিকারীর একটা ধর্ম্ম। সে অকাতরে জুতা খুলিয়া নদীটি পার হইয়া গেল। ওপারে অনেক বাড়ী ও দোকান-ঘর, দক্ষিণদিকের মাঠের ও-পারে একটী ক্ষুদ্র গ্রামের চিহ্ন অপরাহ্নের ধূমোদ্গম দেখিয়া স্পষ্টই বোঝা যায়। লালা-সাহেব এই সুন্দর পল্লীটির ছবি লইতে প্রস্তুত হইল। অপূর্ব্ব সুন্দর সুগঠিত মূর্ত্তি, চোখে চশমা, গায়ে একটা প্লাশ্ কোট্ ক্যামেরাটা পৃষ্ঠে সযত্নে বাধা, চোখেমুখে বেশ একটা আনন্দময় উজ্জ্বল দীপ্তি,—কে এই যুবকটী? দেখি লই বঙ্গবেঁশী সাহেব বলিয়া ভ্রম হয়। পাড়ার সকলেই লালাসাহেবকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিল। কেহ কেহ ভাবিল—জেলার কোনও উচ্চপদস্থ সাহেব ছদ্মবেশে

পল্লীভ্রমণে আসিয়াছেন। চাষাদের নিরক্ষর ছেলেরা তাহার পিছুপিছু চলিল। লালাসাহেব তাহাদের দুএকটা পয়সা দিয়া বিদায় করিল। তাহারা তাহাদের পিতাদের নিকট গিয়া দেখাইল। তাহারা সুখ্যাতি করিয়া বলিল, 'সাহেব খুব সদাশয়।' লালাসাহেব ইতিমধ্যে সেই মাঠ পার হইয়া নিকটস্থ পল্লীটির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

সেই গ্রামে সেদিন অপরাহ্ণে সুধারাণী বস্ত্র-বিতরণ করিতে আসিয়াছে। গ্রামের সেই একটানা কলধ্বনিটি বাঁশীর একটা মিশ্রধ্বনির মত বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। বড় রাস্তার উপর একখানা প্রকাণ্ড ব্রূহাম্ গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। ইহা দেখিয়া লালাসাহেবের আর ক্যামেরা বসাইতে ইচ্ছা হইল না। গাড়ীখানার অবস্থিতি সেই স্নিগ্ধ পল্লী সৌন্দর্য্যের মাঝখানা সভ্যতার বিরুদ্ধে যেন একটা বিষম প্রতিবাদ বলিয়া মনে হইল। তাহার স্থানে বরঞ্চ একখানা খড়ে-বোঝাই গরুর গাড়ী থাকিলে ভাল হইত। লালাসাহেব আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিল, একটী সুবেশা গুণ্ঠনহীনা তরুণী কৃষক পরিবেষ্টিত হইয়া সেই গাড়ীর দিকে আসিতেছে। সে এই অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া আবার ক্যামেরা ঠিক করিতে লাগিল। মাঠের একটী কোণ,—সেখানে গ্রামের দেবী মধুর হাসি হাসিয়া

কৃষকদের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে,—অন্নপূর্ণার মত তাহাদের দুঃখ-দৈন্য ঘুচাইতেছে,—এ দৃশ্যটী লালাসাহেব ফটোপ্লেটে না তুলিয়া থাকিতে পারিল না। মুহূর্ত্তের মধ্যে ফটো তোলা হইয়া গেল, তখন সে রুমালে কপালের স্বেদবিন্দু মুছিয়া আবার একবার সেই দেবীর দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার মুখখানি প্রভাতের বিকচ পদ্মফুলের মত, তাহার মণিবন্ধের সুবর্ণ-কঙ্কণ হাতের অপরূপ শোভার কাছে হার মানিয়াছে। কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া লালাসাহেব একটী চাষাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'এ মেয়েটী কে, বাপু?'

'ওনারে জানো না, বাবু? উনি যে আমাদের জমীদারের ঝি। ওনার বড় দয়ার শরীর।'

লালাসাহেবের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। তখন সুধারাণী গাড়ীতে উঠিয়াছে।

'ওহে, শোনো, শোনো, তোমাদের গাঁয়ে লেখাপড়া শেখাবার কি রকম ব্যবস্থা আছে? স্কুল পাঠশালা আছে?'

'আছে বৈ কি, হুজুর! হুই যে পথ দেখছ, ওনারি মোড়ের পারে বড় স্কুল আছে। আর ল্যাকাপড়া শিখে কি হবে, হুজুর? ল্যাকাপড়ার কথা আপনারা যে বল—উটো কিছু লয়। বুদ্ধি থাকলে সবই হয়, কর্ত্তা। মোর

নাম গণা পাল—বিয়ের সময় মোরে দেখতে এয়েছিল জনার্দ্দন পোদ্দার। তারা যে বড়লোক, ঠাকুর, মুই তাদের ব্যাবরা দেখে ভ্যাবাচ্যাকা লেগেছিলুম। তারা মোর নাম সুদ্রলে। মুই বল্লুম—মোর নাম গণা পাল। নামটা তাদের পছন্দ হলো না ঠাকুর। কি করি, ভাল নাম পাই কোথা থেকে, বল? সকলে মোরে কি ইসারা করতে লাগলো;—পিছনে ছিল ছিদেম ঘোষ, আর সুমুকে ছিল কেষ্টা পোদ,—তার পর, কর্ত্তা, দিলুম ত একটা নাম ঠুকে। তা কর্ত্তা, ওই যে ল্যাখাপড়ার কথাটা বলছ, উটো কিছু লয়।'

লালাসাহেব এই সুদীর্ঘ অথচ অকপট কাহিনী শুনিয়া অতি কষ্টে হাস্য সংবরণ করিল। এদিকে সন্ধ্যার আঁধার ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি গৃহাভিমুখে ফিরিল। তখন ফটো প্লেটের ছবিটী মনের প্লেটে চিরাঙ্কিত হইয়া গিয়াছে।

১৬

সুপ্রশস্ত ছাদের উপর বসিয়া শিউলি ও সুধা গল্প করিতেছিল। সুধার মুখখানি হাসিমাখা, কিন্তু শিউলি বড় অন্যমনস্কা। সে একটা রাঙা ফুলে ভরা সুবৃহৎ

কৃষ্ণচূড়া গাছের দিকে চাহিয়া ছিল। সুধা কহিল, 'তার পর কি হলো?'

'তার পর আর কি হবে? সেই অপূর্ব্ববাবু উঠানে এসেই আমার হাত দুখানি ধরে আমায় বিয়ে করবার কথা বললে, ভাই, এমন সময় হিরুদার মা এসে পড়লেন। তিনি এই সময় এসে পড়ে একেবারে দপ্ করে জ্বলে উঠলেন। যখন আমার জন্যেই এত কষ্ট দিদি, তখন আর কি আমার সেখানে থাকা সাজে?'

'তাই ত। তা তোমার ভাই সেই অপূর্ব্ব বাবুর সঙ্গে কথা কওয়া ভাল হয়নি। এখন আর তোমার কষ্ট হবে না ত?'

'এই তোমাদের বাড়ী ত প্রায় একমাস কেটে গেল, আমার জন্যে কি তোমাদেরও কথা শুনতে হচ্ছে না ভাই? সেদিন ঘাটে গিয়ে শুনি—দত্তদের গিন্নি বলছেন—রাজার নন্দিনী প্যারী যা কর তা শোভা পায়। কথাটা তোমার দাদামশাইকে উল্লেখ করেই বলা হচ্ছিল। সত্যি, দিদি, এ-সব কথা শুনলে ইচ্ছা করে—ঘর ছেড়ে একেবারে উধাও হয়ে চলে যাই।'

'না—না, তুমি যেও না ভাই, আমাদের বাড়ীতে তোমার কি কষ্ট হচ্ছে বল না, ভাই?'

'আমি যে পিশাচী—আমার কি সংসারে স্থান আছে, সুধা ?'

'কেন, এখনো ত তুমি ভাল হতে পারো! তুমি ভালো হবার জন্যই ত দাদামশাই তোমায় এখানে এনেছেন। চল, আমরা দুজনে গোকুলপুরে সেবার কাজের ভার নেই। গরীবদের খাওয়াতে পরাতে এমনি আমোদ হয়, আমার! এ সেবা কে আমায় শিখিয়েছিল জানো ?'

'কে, ভাই ?'

'পণ্ডিতমশাই।'

'কে ? হিরণ্ময় ? ওঃ!'—বলিয়া গম্ভীর হইয়া বসিল।

'অমন করলে কেন ভাই ?'

'কি জানি, ভাই, আমি যা পেয়েছিলুম, তা পাইনি। আমার জীবনটা একটা নিষ্ঠুর অভিশাপ,—যাকে পূজা করেছিলুম, সে আমার পূজার ফুল পায়ে দলে গেছে, আমিও এখন বজ্রের মত কঠিন হয়ে গেছি। তোমাকে তা বোঝাতে পারবো না, ভাই।' বলিতে বলিতে শিউলি অঞ্চলে মুখ ঢাকিল।

'তুমি দুঃখ করো না, দিদি, তোমার কান্না দেখলে

আমারও বড় কান্না পায়। শোনো ভাই, একটা ভারি মজার খবর। আমি সেদিন গোকুলপুরে কাপড় কিনতে গেছি, ফেরবার সময় গাড়ীর কাছে দেখি—চোখে চশমা, গায়ে কোট, কাঁধে একটা চামড়ার ব্যাগ—একজন ধুতি-পরা সাহেবের ছেলে আসছে—'

'সাহেব আবার কাপড় পরে না কি?'

'না, না, আগে শোনো না মজাটা। আমি তাড়াতাড়ি গাড়ীতে ঢুকেই শুনতে পেলুম যে গণা পালের সঙ্গে দিব্যি বাংলা কথা কইছে। সাহেব বাংলা কথা কয় শুনেছ? সে কে সাহেব আমি ত জানি না। দাদামশাই হেসে বললেন—'না, রে না, ও সাহেব নয়। ও দূরসম্পর্কে তোর খুড়তুতো ভাই হয়। ওর নাম লালাসাহেব। বাঙ্গালীর নাম আবার লালাসাহেব হয় কথনো শুনেছ, দিদি? হাঃ, হাঃ, লালাসাহেব! কি অদ্ভুত খোঁট্টার মত নাম!'

'এ খোঁট্টাটার সঙ্গে যে তোমার বিয়ের কথা হচ্ছে। তা বুঝি জানো না। কাল রাত্রে আমি দিদিমার ঘরে বসে আছি, এমন সময় রাজাবাবু এসে বললেন যে ছোট-তরফের জমীদারের ছেলের কাছ থেকে বিয়ের জন্য লোক এসেছে। দাদামশাই বলছিলেন সে বিয়ে হলে অনেক-

দিনের একটা পুরানো ঝগড়া একেবারে মিটে যাবে। তোমার দিদিমা কিন্তু বিষম আপত্তি তুললেন।'

সুধা গম্ভীরভাবে অবনতমুখে সব কথা শুনিতেছিল। এমন সময় শিউলি মৃদু হাসিয়া বলিল, 'আর একটা কথা শুনবি. পাগলি? হিরুদার সঙ্গে তোর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে—তা জানিস ত? রাজাবাবু হিরুদার মাকে সেদিন কথা দিয়ে এসেছেন।'

সুধা হাসিয়া ফেলিল। 'যাও, যাও, আর তোমায় ঘটকালি করতে হবে না! কিন্তু শিউলি লক্ষ্য করিল যে, এই শেষোক্ত সংবাদে সুধা বিশেষ উল্লসিত হইয়া পড়িয়াছে। শিউলি বলিল, 'শোন্, একটা গান শোন্—

—হৃদয় আমার গোপন করে
আর ত লো সই রাখতে নারি!'

শিউলির কণ্ঠ বড় সুন্দর। সুধা সে কণ্ঠস্বর ও এই গান শুনিয়া তন্ময় হইয়া পড়িল। সে শিউলিকে আর একটা গান গাহিতে বড় অনুরোধ করিতে লাগিল। শিউলি বলিল 'আবার তোর বাসর ঘরে গাইব—আজ এই পর্যান্ত!'

তার পর দুইজনে জীবনকুমারীর ঘরে আসিয়া প্রবেশ

করিল। জীবনকুমারীর অম্বলের অসুখ এই কয়েকদিন হইল বড় বাড়িয়াছে। দুইজনে জীবনকুমারীকে প্রণাম করিল। তিনি তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ করিলেন। এমন সময় যদুনাথ সেই ঘরে আসিলেন। দুইজনেই জানিত—ইহা যদুনাথের স্ত্রীর সহিত বিশ্রম্ভালাপের সময়। সেজন্য শিউলি ও সুধা ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। যদুনাথ জীবনকুমারীর পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আজ কেমন আছ গা ?'

'আজ পেটের যন্ত্রণাটা বড় বেশী। কিছুতেই আর স্থির হতে পারছিনি। এখন গেলেই জ্বালা জুড়োয়। সুধীর বিয়ের কি করলে ?'

'আমি ত বড়ই বিপদে পড়েছি। ব্যাপারটা সব বলি শোনো !—গোকুলপুরে সেদিন সুধা কাপড় বিলুতে গিছল। পথে আসবার সময় অজয়ের ছেলে লালাসাহেব তাকে দেখেছে। লালাসাহেবকে জান ত ? ছেলেটা বড় সৎ। দেখতে শুনতেও যেমন, স্বভাবচরিত্রেও তেমনি। এখন সে জমীদারী নিজের হাতেই নিয়েচে। লালা সুধাকে দেখে ভারি পছন্দ করে ফেলেছে। আজ সকালে তার নায়েব বিয়ের কথা বলবার জন্য এসেছিল। তুমি ত জানো, অনেক কালের একটা পুরানো মকদ্দমা নিয়ে দুই তরফে

চিরকালই মনান্তর চলে আসছে। 'আজ যখন অজয়ের পুরানো নায়েব আমার কাছে এসে দাঁড়াল তখন আশী বছরের সব বিবাদ ভুলে গেলুম, গিন্নি। মনে হলো, আমরা ত সবাই এক পিতার সন্তান ছিলুম, আজ না হয় ভিন্ন হয়ে পড়েছি। অকালবার্দ্ধক্যগ্রস্ত শোক জর্জ্জরীভূত অজয় ছেলের বিয়ের জন্য মরবার কিছু পূর্ব্বেই একবার চেষ্টা করছিল, আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে চেয়েছিল,—কিন্তু আমি তখন অটল গর্ব্বের সিংহাসনে বসেছিলুম,—শোকের সময় তাকে সান্ত্বনা দিতে পারিনি, বয়সে বড় হয়েও তাকে ভাই বলে বুকে তুলে নিতে সাহস করিনি, আপনার বলে সব বিবাদ-বিসংবাদ ভুলেও ত যেতে পারিনি! মানুষ যখন যথার্থ বড় আসন থেকে ধূলায় নেমে আসে, তখনি ত সে দেবতা। আর কাকে দেবতা বল, গিন্নি? কিন্তু এখন কি করি, বল? আমি ত হিরণ্ময়ের মাকে একরকম কথাই দিয়ে ফেলেছি। কিন্তু দেখ, লালার সঙ্গে সুধার বিয়ে হলে আমার অবর্ত্তমানে দুটো জমীদারীই এক হয়ে যাবে। এ বিবাহে বংশগত একটা কলহ' একেবারে মিটে যাবে। লালার কথা একবারও মনে হয়নি—জমীদারের ছেলে সুখের কোলে লালিত পালিত হয়েও লালা ঠিক সরল শিশুর মতই আছে। তুমি

ত তাকে ছেলেবেলা দেখেছ, গিন্নি। কেন, মনে পড়ে না ?'

যদুনাথ আবার বলিলেন, 'এখন কি করি বল ? আমি ত মহাবিপদে পড়েছি। কাল আবার লোক আসবে বলেছে।'

গিন্নি উদাসভাবে চাহিয়া রহিলেন। কোনও কথা বলিলেন না। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জীবন-কুমারী বলিলেন, 'দেখ, আমরা উপযুক্ত মনের মত বর পাইনি বলেই ত হিরুকে পছন্দ করেছিলুম ? হিরুকে মনের মত করে' গড়ে তুলবো বলেই ত তাকে পছন্দ করে-ছিলুম ? এখন লালাসাহেবের মত বর আর তুমি পাবে না। সে যখন সব বিবাদ ভুলে আমাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন'—এতগুলি কথা গিন্নি এক সঙ্গে অনেক-দিন বলেন নাই, তাই তাঁহার শ্বাসকষ্ট হইল, উদরের যন্ত্রণাটা নূতন করিয়া বাড়িল, তিনি আর কোনও কথা কহিলেন না। কেবল একটা বিষম যন্ত্রণাসূচক 'উঃ !' শব্দ তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল।

যদুনাথ সব কথা শুনিয়াও কিছু বলিলেন না। তিনি গিন্নির কপালে হাত বুলাইতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে গিন্নি চোখ চাহিলেন। যদুনাথ বলিলেন, 'আচ্ছা,

ও-সব কথা পরে ঠিক হবে। আপাততঃ সুধার বিয়ে স্থগিত রইল। তুমি আগে একটু সেরে ওঠো।'

গিন্নি বলিলেন, 'আমার আর সেরে ওঠবার আশা ছেড়ে দাও। তবু বিয়েটা যদি দেখে যেতে পারি।'

কিয়ৎক্ষণ পরে রোগীর কক্ষে সুধা আলো জ্বালিয়া আনিল। তাহার মুখখানি সেই প্রদীপালোকে বড়ই ম্লান দেখাইতেছিল।

১৭

মত্তাবস্থায় সেই যে ধনঞ্জয় বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছে, আর ফেরে নাই। নবগোপাল পূর্ব্বেও তার কোনও খবর লইত না, এখনও লইল না। সে পুত্রবধূ ঊষাকে অত্যন্ত স্নেহ করিত। নবগোপালের শরীর সংপ্রতি অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় সে আর যতুনাথের নায়েবী করে না। পুত্রকে শাসনে রাখিতে পারে না বলিয়া সে যতুনাথের নিকট অত্যন্ত নিন্দিত হইয়াছে। পুত্রের নৈতিক অধঃ-পতনের পর যতুনাথের কাছারীতে ও প্রজামহলে তাহার মান বাঁচাইয়া কাজ করা অসম্ভব হইয়াছিল। লোকটা একটু ধর্ম্মবাদী বটে, কিন্তু মোটের উপর নবগোপালের হৃদয়টী পারিবারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য সর্ব্বদাই

উন্মুখ হইয়া থাকিত। সে যদুনাথের স্বেচ্ছা-প্রদত্ত অর্থ যথেষ্ট পাইয়াছিল, কিন্তু কখনো ঘুষ লয় নাই। বৃদ্ধবয়সে বিপত্নীক হওয়ায় তাহার উপর যদুনাথের কেমন একটা মানসিক আকর্ষণ জন্মিয়াছিল। কিন্তু যখন সকলের নিকট হইতেই ধনঞ্জয়ের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আসিতে লাগিল, তখন তিনি এক দিন নবগোপালকে ডাকিয়া বলিলেন, 'নব, আর তোমায় কাছারীতে আসতে হবে না, তুমি বাড়ীতে বসেই মাহিনা পাবে।' এতদূর হইবে—নবগোপাল কখনো আশা করে নাই। সুদক্ষ কর্ম্মচারী বলিয়া তাহার খুব সুখ্যাতি ছিল। সে রাজাবাবুর সম্মুখে কহিল, 'আমার কাজও যখন শেষ হলো, তখন মাহিনাও চাই না। যে কদিন বেঁচে আছি, ওর নাম গে—আপনার আশীর্ব্বাদে একরকম চালিয়ে নিতে পারবো।'

নবগোপল চলিয়া আসিল বটে, কিন্তু তার সাংসারিক অবস্থা এমন নয় যে বসিয়া খাইতে পারে। কিন্তু উষারাণী বড় লক্ষ্মী বউ,—তাহার সেবায় ও গৃহস্থালীর ব্যবস্থায় সংসারের কোন অভাবই নবগোপালের চক্ষে পড়ে নাই। জমীদারীর কাজে অনেক সময় তাকে মফঃস্বলে কাটাইতে হইত, আজ সংসারের কেন্দ্রস্থলের মধ্যে সে যখন নিজ অবিচ্ছিন্ন অবকাশ লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল, তখন দেখিল

যে পুত্রের দুর্নীতির জন্য বধূর মনে একটুও সুখ নাই, অথচ সংসার-যন্ত্রটা এমনি নিঃশব্দে দুইবেলা বেশ চলিয়া যাইতেছে। তার পর যখন এক দিন সংবাদ আসিল যে, মাতাল অবস্থায় সে একটা নিরীহ কৃষকপুত্রকে প্রহার করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে, তখন নবগোপাল নিজের অবস্থা বেশ ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিল। ক্রমে ধনঞ্জয়ের নামে গেরেপ্তারি পরোয়ানা বাহির হইল, তাহার বাড়ী খানাতল্লাস হইল, পুলিশ-ইন্‌স্‌পেক্‌টার উষাকে জেরা করিলেন যে, সে স্বামীর কোনও সংবাদ জানে কি না। এই সমস্ত ঘটনার সমবায়ে বৃদ্ধের হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

'মা, একবার আমার কাছে এসো' বলিয়া নবগোপাল যখন পুত্রবধূকে ডাকিল, তখন উষা উপরের কক্ষে বসিয়া কাঁদিতেছিল। সে এই অশ্রু সম্বল করিয়া ভগবানকে সকাতরে ডাকিতেছিল, যেন তিনি তাহার স্বামীকে সুমতি দেন। উষা তাড়াতাড়ি আসিয়া শ্বশুরের জন্য আসন পাতিয়া দিল। 'মা, তুমি কাঁদছিলে'—বলিয়া নবগোপাল যখন সস্নেহে পুত্রবধূর চিবুক ধরিয়া সেই বিকচম্লান কমলের মত মুখখানি তুলিয়া ধরিল, তখন সে তার স্বকীয় মুদ্রা দোষটা বিস্মৃত হইয়াছে। সংসারের নিবিড় বন্ধনে যে

আনন্দ, সংসারের দুঃখভোগে যদি আর একজন সহমর্ম্মী পাওয়া যায়, তাহা হইলে আরও আনন্দ।' দুঃখভোগে এই সহমর্ম্মীর নিকট মানুষের হৃদয়ের যথার্থ দিকটাই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। নবগোপাল বলিল, 'কেঁদো না মা, আমি বুড়া মানুষ, আমার সুমুখে কেঁদো না। আর কটা দিনই বা আমার আছে! কিন্তু আমি যে মা তোমার হাসি মুখখানি দেখে যেতে পারলুম না!'

ঊষা শ্বশুরের সঙ্গে কথা কহিত। সে অবনতমুখে কহিল, 'না, বাবা, আমি আর কাঁদবো না। আপনি এখন খেতে বসুন। বড় বেলা হয়ে গেছে।'

নবগোপাল গোপনে অশ্রুসংবরণ করিয়া ভোজনে বসিল। পার্শ্বে ঊষারাণী বসিয়া রহিল। এমন সময় পুরুষকণ্ঠে কে ডাকিল, 'বোসজা মশাই বাড়ী আছেন?'

নবগোপাল আহার করিতে করিতেই উত্তর দিল, 'কে হে—একটু বোসো, ওর নাম কি—খেতে বসেছি।'

আহারান্তে নবগোপাল বাহিরে আসিয়া দেখিল একটী ভদ্রবেশী যুবক দাঁড়াইয়া আছে। সে অপূর্ব্ব।

'আসুন, আসুন, নমস্কার।'

'নমস্কার, আপনাকে ত আমি—ওর নাম কি—ঠিক চিনতে পারছি না।'

'আমার এই গ্রামেই বাড়ী। ধনঞ্জয়বাবুর সঙ্গে আমার খুব আলাপ ছিল।; আমরা একই ক্লাসে পড়তুম। তা তার কিছু খবর পেয়েছেন?'

'তার নাম আর আমার কাছে করবেন না। সে—ওর নাম কি—আমার চোখে মরেই গেছে। আপনার কি দরকারটা?'

'তার সম্বন্ধেই একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো বলে এসেছিলুম।'

'আমায়—ওর নাম গে—মাপ করতে হবে। তার সংস্রবে আমি আর থাকতে চাই না।'

'কিন্তু একটা কথা যে আপনাকে না বলে পারছি না।'

'আচ্ছা, ওর নাম কি—বলুন।'

অপূর্ব্ব ধনঞ্জয় ও শিউলি সংক্রান্ত সমগ্র কাহিনীটা নবগোপালকে শুনাইল। শিউলি যে এখন যদুনাথের আশ্রয়ে আছে, তাহা নবগোপাল জানিত। ব্যাপার শুনিয়া সে ঘৃণায় মুখ ফিরাইল। অপূর্ব্ব কেবল শিউলির পুত্রোৎপত্তি ও তাহার মৃত্যুর কথা বলিল না।

'তা—ওর নাম কি—আমায় এ খবর শোনাবার কি দরকার—'

'ধনঞ্জয়ের সঙ্গে অনেকদিনের পরিচয়, সে আমার বড়

আপনার ছিল। আপনাদের যাতে মঙ্গল হয়, তাই আমার লক্ষ্য। এখন এই শিউলি গর্ভাবস্থায় আছে। আপনি রাজাবাবুকে বলে তাকে এখনই হাত করে ফেলুন। নইলে, সে প্রসব হলে নিশ্চয়ই ভরণপোষণের জন্য আপনার নামে মকদ্দমা আনবে। কিন্তু যদি এখন থেকে আপনি তাকে হাতের মধ্যে এনে ফেলেন—'

'বাবাজী, ওর নাম কি—যা বললে তা ঠিক বটে। কিন্তু রাজাবাবুর সঙ্গে আর ত আমার কোনই সম্বন্ধ নেই। কোন্ মুখে তার কাছে গিয়ে ওকথা বলবো?'

'তার ত উপায় আছে। কিন্তু আপনাকে একটা মিথ্যা বলতে হবে। স্বকার্য্য উদ্ধার করতে হলে মিথ্যায় কোনও দোষ নেই।'

'কি প্রস্তাবটা, বাবাজী?'

'আপনি গিয়ে বলুন যে, ধনঞ্জয়ের জন্যই যখন মেয়েটীর এই অবস্থা, তখন আমিই এর ভরণপোষণের জন্য দায়ী। আর আপনি বুড়া হয়ে পড়েছেন, সংসারে কেউ নেই, এ সব কথাও বলবেন। তাহলে রাজাবাবু কোনই আপত্তি করবেন না।'

'কিন্তু আমি—ওর নাম কি—কেমন করে একটা

বেশ্যাকে ঘরে নিয়ে আসবো। আমার বউমার চোখের জল—'

অপূর্ব্ব খুব মন্ত্রণা পরায়ণ। সে হঠাৎ বাধা দিয়া বলিল, 'আপনি যে তাকে এখানেই এনে রাখবেন, তার মানে কি আছে? আমরা পাঁচজন থাকতে এ বিষয়ে আপনাকে কোনও কষ্ট পেতে হবে না। তার সম্বন্ধে আমরা একেবারে নিশ্চিন্ত না হয়ে কি ছাড়বো?'

কথাটার মধ্যে একটা অঁাধারময় ইঙ্গিত আছে ভাবিয়া নবগোপাল শিহরিয়া উঠিল। সে বলিল, 'না, বাবাজী, আমি ওর নাম গে—ও-সব গোলমালের ভিতর নেই।'

অপূর্ব্ব যেন মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, 'আপনার এই বৃদ্ধাবস্থা, তাতে কাজটাও গেছে, আর মাথার উপর এই বিপদ,—আমি আপনার মঙ্গলের জন্যই বলছিলুম।'

'হঁা. বাবা, ওর নাম কি—তুমি বাবাজী মাঝে মাঝে এখানে একবার এসো না! তোমায় দেখলে আনন্দ হয়।'

'সে কি কথা বলছেন, আসবো বই কি'—বলিয়া অপূর্ব্ব নবগোপালকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

কথাগুলি নবগোপালের মনে লাগিল। রাজাবাবু যে তাহার প্রতি বীতরাগ হইয়াছেন, সে বিষয়ে তাহার

একটুও সন্দেহ ছিল না। শিউলি-সংক্রান্ত ঘটনাটাই যে তাহার কর্ম্মচ্যুতির কারণ, তাহাও সে বুঝিয়াছিল। কিন্তু রাজাবাবু শিউলিকে শেষে আশ্রয় দিলেন কেন? নিশ্চয়ই কোনও অভিসন্ধি আছে। সে অভিসন্ধিটা যে নবগোপালের পক্ষে অনুকূল নয়, তাহা বুঝিতে কষ্ট হইল না। বৃদ্ধবয়সে সে কি আবার বেশ্যার খরচ যোগাইয়া আসিবে?

নবগোপাল সব দিক ভাবিয়াও কিন্তু কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। সে কোন্ মুখে আবার রাজাবাবুর দ্বারে গিয়া দাঁড়াইবে? যাহারা দুঃখের জ্বালা নীরবে সহ্য করে, তাহারা পরের কাছে ভিক্ষার জন্য হাত পাতিতে পারে না। ক্রমে ক্রমে উষার মুখখানি মনে পড়িল—বেদনামাখা, অশ্রুহীন হইলেও নবগোপাল বেশ বুঝিত যে, এই নিরশ্রু অন্তরের নীচে অশ্রুর একটা বিরাট ফল্গু বহিয়া চলিয়াছে। না, না, না—তাহার বিদ্রোহী হৃদয় অপূর্ব্বের প্রস্তাব একমুহূর্ত্তেই পরিত্যাগ করিল।

সন্ধ্যার ঘনীভূত আঁধারে বধূ আসিয়া ডাকিল—'বাবা!' নবগোপাল চমকিয়া উঠিল। 'বাবা, আপনার যে ঠাকুর ডাকবার সময় হয়েছে!' 'চল, মা, উঠি'—বলিয়া স্নেহময় শ্বশুর শিশুর মত বধূর অনুগামী হইল।

১৮

শিউলিকে কোনও উপায়ে হস্তগত করিবার জন্য অপূর্ব্ব উদ্দাম হইয়া পড়িয়াছে। সে একবার ভাবিল—নবগোপালকে দিয়া কার্য্য উদ্ধার করিয়া লইবে, কিন্তু সেদিন নবগোপালের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া বুঝিল যে, তাহার দ্বারা কার্য্য সাধনের বিশেষ কোনও সম্ভাবনা নাই। নবগোপালের যতই দোষ থাক না কেন, সে ভীরুপ্রকৃতি। যদুনাথের নিকট গিয়া শিউলির বিষয়ে সে কোন কথাই বলিতে পারিবে না। সুতরাং তাহার উপর আস্থা স্থাপন করা বৃথা। তখন অপূর্ব্ব ভাবিল—কোনও উপায়ে শিউলিকে যদুনাথের গৃহ-দুর্গ হইতে বাহির করিতে পারিলেই কার্য্য-সিদ্ধি হইবে। সে বেশ বুঝিয়াছিল—শিউলিকে একবার হস্তগত করিতে পারিলে তাহার মন জয় করা সময়-সাপেক্ষ হইবে না। তাহার কেবলই মনে পড়িত—শিউলির সেই বিকচ সুন্দর মুখখানি। পাপ কি এই নির্ম্মল মুখে কোনও রেখা আঁকিতে পারে নাই? যেখানে কলুষতা থাকে, সেখানে বদনমণ্ডলে তাহার চিরাঙ্কিত চিহ্নও থাকে। কিন্তু শিউলি যেন শাপভ্রষ্টা উর্ব্বশী।

এই সব চিন্তা তাঁহার মনে উদয় হইলে সে একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িত।

অপূর্ব্ব যদুনাথের এলাকা পরিত্যাগ করিয়া তিন ক্রোশ দূরে লালাসাহেবের জমীদারীর ভিতর একটী ঘর ভাড়া লইল। সে সন্ধ্যাবেলা বাঁশী বাজাইত। একদিন সূর্য্যাস্ত-লীন আকাশের শোণিমদীপ্তি দেখিতে দেখিতে সে আনমনে বাঁশী বাজাইতেছে, এমন সময় সেখানে লালাসাহেব আসিল। অপূর্ব্ব লালাসাহেবকে চিনিত না। এই চিন্তা-ক্লিষ্ট সুন্দর-দর্শন যুবকটী অনেক দূরে একটী প্রান্তরের উপর বৃক্ষমূলে বসিয়া খুব নিবিষ্টচিত্তে একখানি স্কেচ্ আঁকিতেছিল। কিন্তু সহসা বাঁশীর মোহনস্বরে একটা বেহাগ রাগ শুনিয়া সে উন্মুখ হইয়া রহিল। অজয়চন্দ্র পুত্রকে সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যায় শিক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্তু চিত্রে এখনও লালাসাহেবের হাত কাঁচা,—তবে সে ছোট ছোট water colour ছবিগুলি বড় সুন্দর আঁকে। সেদিন সে আঁকিতেছিল—সেই শুষ্কপ্রায় বাঁকা নদীটির ওপারে একটা উচ্চ ভূমির উপর করতলন্যস্তকপোল হইয়া সেই বালিকাটী শকুন্তলার মত বসিয়া আছে। তাহার ক্রোড়-তলে সেদিনকার সেই ফটোখানিও ছিল।

অপূর্ব্ব অনেকক্ষণ ধরিয়া এই যুবকটীকে লক্ষ্য করিল।

শেষে সে কৌতূহল সংবরণ করিতে না পারিয়া, নিকটে আসিয়া লালাসাহেবকে নমস্কার করিল। লালাসাহেব শিশু-সুলভ দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি? আপনাকে ত এখানে কখনো দেখিনি।'

অপূর্ব্ব বলিল, 'আমার নাম অপূর্ব্বকুমার সেন। আমি নয়ানপুরে ছিলুম, সংপ্রতি অজয়বাবুর জমীদারীতে উঠে এসেছি। আপনি কে?'

লালাসাহেব বলিল, 'অজয়বাবু আমার পিতা। আমাকে সবাই 'লালাসাহেব' বলেই জানে। তবে নামটা একটু পাঞ্জাবী গোছের। কারণ লাহোরেই আমার জন্ম হয়েছিল।'

অ।—আপনি কি ছবি আঁকচেন আমি দেখতে পারি? আমারও ঐ রোগটা আছে কি না? তবে আপনার যেটা সখের জিনিষ, আমার সেটা জীবিকার একমাত্র উপায়।

লা।—তাই না কি? আমি এখনো ভাল আঁকতে শিখিনি—এখানি কদিন ধরে আঁকতে চেষ্ট করছি, কিন্তু back ground-টা কিছুতেই ঠিক করতে পারছিনি।

অ।—বাঃ! চমৎকার ছবি হয়েছে। back ground-টায় তত নজর না দিলেই ভাল হয়। এমন সুন্দর মূর্ত্তিটী

দেবতার আশীর্ব্বাদের মত এঁকেছেন সব প্রাণ দিয়ে, সব মন দিয়ে! কিন্তু মুখটা যেন কোথাও দেখেছি!'

অপূর্ব্ব সুধারাণীকে অনেকবারই দেখিয়াছে, তবে এ ক্ষেত্রে সে একটু সতর্কতা অবলম্বন করিল। কিন্তু লালা-সাহেব বড় সরল, সে একেবারেই বলিল, 'দেখুন, ঐ নদীটির ওপারে দিনকয়েক আগে বেড়াতে গিয়ে এই মেয়েটীকে দেখে আমার ভারি পছন্দ হয়েছিল। আমি তার ফটো নিয়েছিলুম। পরে অনুসন্ধানে জানতে পেরেছি সে যদু জ্যেঠামহাশয়ের নাতনী সুধারাণী।'

অ।—হাঁ, হাঁ, মনে পড়েছে! আমি ত একে কতবার দেখেছি! কিন্তু কিছুতেই মনে পড়ছিল না!

লা।—আপনি একটু বসবেন? আপনার ত চিত্র-শিল্পে বেশ দখল আছে, তাহলে আমার পোর্টফোলিওখানা একবার দেখুন না!

অ।—সানন্দে দেখব! আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে আমি ভারি সুখী হলুম। একে আমার নিঃসঙ্গ জীবন, সংসারে ত আর কেউ নেই আমার! তাই একলা ভারি কষ্ট হয় এক একবার!

লা।—কেন, আপনি বিয়ে করেন নি?

অ।—না, করবো মনে করেছি। আপনি?

লা।—আমার সে লম্বা ইতিহাস। আমি এই মেয়েটা ছাড়া অন্য মেয়েকে বিয়ে করবো না।

অ।—অঁা, সে কি? সুধার সঙ্গে আপনার বিয়ে? তা কি করে হবে? যদুবাবু যে ওর বিয়ে ঠিক করে ফেলেছেন শুনেছি।

লা।—কই, আমি ত শুনিনি! কার সঙ্গে ঠিক হয়েছে? আপনি জানেন কিছু?

অ।—হাঁ, জানি বৈ কি, যদুবাবু নিজে গিয়ে বিবাহ ঠিক করে এসেছেন, এমন কি কথাও দিয়ে এসেছেন। পাত্র আমার বন্ধু হিরণ্ময়। মস্ত বড় সংস্কৃত পণ্ডিত সে, আবার বি-এ পাশও করেছে। হিরণ্ময় সুধার মাষ্টার ছিল।

লা।—দুজনের মধ্যে বেশ জানাশুনা আছে তাহলে?

অ।—আছে বই কি। আমার মনে হয় হিরু সুধাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না। তার মা'রও মনে মনে ঐ ইচ্ছা। তবে মা ও ছেলের খুব উঁচু মন কি না, তাই কারুর কাছে ঘাড় নীচু করতে চায় না। অথচ তাদের শক্তি কতটুকু!—আপনি ওদের সব ব্যাপার জানেন না?

লা।—কি করে জানবো বলুন? কতদিন পরে দেশে এসেছি, এঁসে সবই আমার চোখে নূতন ঠেকচে।

দীর্ঘকাল আমার বিদেশেই কেটে গেছে, লোকের সঙ্গে ভাল করে মেশবার সুযোগ কখনই আমার হয়নি। শিক্ষার একটা দিক আমার কাছে চিররুদ্ধ রয়ে গেছে। তার পর ওদের ব্যাপার কি বলছিলেন?

অপূর্ব্ব হিরণ্ময়ের পিতৃ-পরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া মোক্ষদাসুন্দরীর চরিত্রের দৃঢ়তা ও শিউলি-সংক্রান্ত সমস্ত ঘটনা বলিয়া গেল। কিন্তু হিরণ্ময়ের গৃহ ত্যাগ করিয়া শিউলি যদুনাথের বাড়ী কি জন্য গেল ও এই সম্পর্কে তাহার নিজেরই বা কতখানি দায়িত্ব ছিল—সে সব কথা কিছুই বলিল না।

লালাসাহেব সব শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। বিশেষতঃ সুধার সঙ্গে হিরণ্ময়ের যে স্নিগ্ধ প্রীতিটুকু জন্মিয়াছে, তাহা সে সহজেই বুঝিতে পারিল। কিন্তু বাস্তবিক সুধা কি হিরণ্ময়কে ভালবাসে? তাছাড়া সে যদুনাথের দৃঢ় চরিত্রের কথাও বহুপূর্ব্বে পিতার কাছে শুনিয়াছিল। তিনি যদি মোক্ষদাসুন্দরীকে বাগ্‌দান করিয়া থাকেন, তবে কেমন করিয়া সে অঙ্গীকার আবার অস্বীকার করিবেন? তাহার মন বিষাদে ভরিয়া গেল। সে কথা কহিল না,—স্কেচ্ ও ফটোখানি নীরবে পোর্ট-ফোলিও'র মধ্যে রাখিয়া অনন্ত শূন্যের দিকে স্বপ্নালসনয়নে

চাহিয়া রহিল। সূর্য্য অনেকক্ষণ অস্ত গিয়াছে, কিন্তু পশ্চিম আকাশের কোলে সেই অরুণরাগ তখনও বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। সন্ধ্যার এই অভিনব সকরুণ নিঃশব্দ আগমনে লালাসাহেবের ব্যথিতচিত্ত যেন গলা ছাড়িয়া বলিয়া উঠিতে চাহিল—'ওগো, তোমায় ভুল বুঝেছি গো, ভুল বুঝেছি! তুমি অন্যের, তা জানতুম না! ওগো, আমায় ক্ষমা করো!' অপূর্ব্ব নিঃস্পন্দ হইয়া পোর্ট-ফোলিওখানা লইয়া নাড়া-চাড়া করিতেছিল। লালাসাহেব সহসা বলিল, 'তাহলে আজ উঠি, অপূর্ব্ব বাবু, কাল বোধ হয় আবার এখানে আপনার সঙ্গে দেখা হবে। আপনার সঙ্গে আজ আলাপ করে আমি বড় সুখী হলুম। আচ্ছা, আসি, নমস্কার।' এই বলিয়া সে ত্বরিতচরণে মাঠ পার হইয়া চলিয়া গেল, অপূর্ব্বের প্রতিনমস্কারের অপেক্ষা করিল না।

অপূর্ব্ব ভাবিল, কেমন সহজ সরল অমায়িক এই মানুষটী! মনের মধ্যে কোনও কপটতা নাই, অথচ সে তাহারি মত এমন একটা অদ্ভুত অবস্থায় পড়িয়াছে যে সেখানে সহ্য করা ছাড়া আর অন্য পন্থা নাই। অপূর্ব্ব বেশ জানিত—সুধার সঙ্গে লালার বিবাহ হওয়া অসম্ভব। যদুনাথের বাগ্‌দান বিফল হইবার নহে।

কিন্তু এ চিন্তা তাঁহার মনে স্থায়ী হইল না,—সে শিউলির উদ্ধার-কল্পনা করিতে করিতে দেখিল—আঁধার রজনী তূর্ণবেগে বিশাল প্রান্তরের উপর মৃত্যু-কালিমার মত ছাইয়া আসিতেছে। অপূর্ব্বের চক্ষু দুটী সেই অন্ধকারে জ্বলিয়া উঠিল—'হাঁ, হয়েছে। বাঃ! এতক্ষণ এ বুদ্ধিটা মাথায় যোগায় নি কেন?' সে নিজের বাসার দিকে চলিয়া গেল।

১৯

চৈত্রমাস কাটিয়া গেল। বৈশাখ মাসেরও প্রথম সপ্তাহ অতীত হইয়া যায়, কিন্তু মোক্ষদাসুন্দরী দেখিলেন যে জমীদার-বাড়ী হইতে আর কোনও সংবাদ আসিল না। তিনি ভাবিলেন বোধ হয় গিন্নীর অসুখ বাড়িয়াছে ও বিবাহ স্থগিত রহিবে। সেদিন তিনি ঘরের দাওয়ায় বসিয়া নিজের বাগানের ফলমূলাদি পাড়ার দরিদ্র বিধবাদের জন্য বণ্টন করিয়া রাখিতেছিলেন, এমন সময় হিরণ্ময় হাসিমুখে পূজার ঘর হইতে বাহির হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। মাতা হাসিয়া বলিলেন, 'পাগল ছেলে! খেয়াল মত আমায় প্রণাম করা হয়! আজ এত হাসি কেন রে? আমি আশীর্ব্বাদ করছি যেন মনের মত টুক্-টুকে বউ হয়!'

হিরণ্ময় আবার হাসিয়া বলিল, 'বাঃ! বেশ মা-টী আমার!—ছেলেকে পর করে দেবার চেষ্টা তোমার যে খুব দেখছি!'—সহসা সে গম্ভীর হইয়া কহিল, 'না, মা, আমার ও জমীদারের বাড়ী বিয়ে কখনই হবে না, জেনে রেখো।'

মো।—সে কি রে! যদুবাবু নিজে কথা দিয়ে গেছেন—হবে না কি রকম? কেন, তিনি কি কিছু বলে পাঠিয়েছেন?

হি।—তিনি আমায় কিছু বলেননি বটে, কিন্তু কাল রাত্রে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি। বাবা যেন আমার মাথার শিয়রে এসে আমায় স্নেহভরে ডাকলেন, 'দেবকুমার! দেবু! এখনো ঘুম ভাঙ্গেনি?' আমি চমকে উঠলুম, তিনি দূরে দাঁড়িয়ে আমায় যেন কি আশীর্ব্বাদ করলেন, আর বললেন, 'দেখ, দেবু, ওখানে তোমার বিয়ে হবে না। যার যেমন অবস্থা, তার তেমনি থাকাই ভাল।' তাঁর কি সুন্দর চেহারা হয়েছে, মা! যদি তুমি দেখতে! আমি যেই তাঁকে প্রণাম করতে গেলুম, অমনি তিনি 'থাক্, থাক্' বলে সরে গেলেন। সেই পদ্মপলাশের মত মুখ আর আমি দেখতে পেলুম না। মা, তুমি কাঁদছ? কাঁদছ কেন, মা?'

হিরণ্ময়ের হাসি মিলাইয়া গেল। সে মাতার নিকট

বসিল। মোক্ষদা' বলিলেন, 'না হিরু, কাঁদিনি, তবে তিনি এখনো আমাদের ভুলতে পারেননি। তিনি যখনই যে কথা বলেছেন, তখনি তা সত্য হয়েছে। হিরু, আজ তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো।'

'কি কথা, মা?'

'সুধার সঙ্গে তোর যদি বিয়ে না হয়, তাহলে আমি যে মেয়ে পছন্দ করবো, তাকে তুই বিয়ে করবি ত?'

'মা!'

'কি বাবা?

'আমায় তুমি বিয়ের সম্বন্ধে আর কোনো অনুরোধ করতে পারবে না। প্রাণান্তেও তোমার মনে কষ্ট দিতে চাই না, কিন্তু তুমিও কষ্ট দেবার অবকাশ রেখো না, মা। তাহলে আমার আরও কষ্ট হবে।'

'আজ কেন এ কথা বলছিস, হিরু? কই, তোর মুখে ত এমন কথা কখনো শুনিনি।'

'না, মা, আমি বিয়ে করবো না।' এই বলিয়া হিরু উঠিয়া গেল। মোক্ষদাসুন্দরীর তথনো সন্দেহ গেল না। তিনি ভাবিলেন—স্বপ্নের কথা ও যদুবাবুর বাক্যদান, কোন্‌টা বেশী প্রত্যয়জনক? না, না,—তাঁহার স্বামী যে নরলোকে দেবতা ছিলেন, তিনি যখন স্বপ্নে হিরুকে

দেখা দিয়া বলিয়া গিয়াছেন, তখন সে কথা কখনো মিথ্যা হইবার নহে। মোক্ষদা অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিলেন, শেষে ঠিক করিলেন যে যদুনাথবাবুকে খবর দেওয়া হউক যে কোনও বিশেষ বাধা উপস্থিত হইবার জন্য এ বিবাহে আর তাঁহার মত নাই। কেন শেষে জমীদার বাবুর লাঞ্ছনা ভোগ করা? তাহার অপেক্ষা মোক্ষদাই পূর্ব্বপক্ষ অবলম্বন করুক।

মোক্ষদাসুন্দরী উঠিলেন। পাড়ার মাধব দাসকে ডাকিয়া বলিলেন, 'দেখ, মাধবদাদা, তোমায় একটা কাজ করতে হবে। এখনই একবার জমীদারবাড়ী যেতে হবে। পারবে কি?'

'কেন পারবো না, দিদি? কি কাজ বল।'

'তোমায় একটা কথা জমীদার বাবুকে বলে আসতে হবে। কথাটা বড় গোপন। তাঁকে গিয়ে বলবে যে দিদিঠাকরুণ বলে দিলেন যে কুটুম্বিতা হবার কোনই আশা নেই—তিনি অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করেছেন যে জমীদারের সঙ্গে প্রজার আত্মীয়তা হওয়া অসম্ভব। জমীদারবাবু কি বলেন আমায় এসে বলো।'

'বেশ, দিদিঠাকরুণ, চললুম।'

মাধব পাড়ার মোড়ল। বয়সে বৃদ্ধ, বেশ বিচক্ষণ

কৃষক। সে যদুনাথবাবুর সমক্ষে গিয়া মোক্ষদাসুন্দরীর বার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। যদুনাথ বিবাহ সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত না হইলেও তাঁহার মনে বেশ একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। সহসা মোক্ষদা-প্রেরিত সংবাদে তিনি যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। কিন্তু অকূলে তিনি যেন কূলভূমির দেখা পাইলেন। ভাবিলেন—সত্যদানের কথাটা ত আর তিনি ভঙ্গ করিতেছেন না! তবে আর আক্ষেপের কারণ কি? সত্যপালন তাঁহার জীবনের ধর্ম্ম,—সত্যের অপলাপ হইলে ধর্ম্মচ্যুত হইতে হয়। ইহাই তাঁর জীবনের আজীবন সংস্কার। মাধবকে জমীদারবাবু বলিলেন, 'তোমার দিদিঠাকরুণকে গিয়ে বলো যে আমার আর কোন দোষ নেই। কাজের তাড়ায় আমি তাঁদের কোনও খবর নিতে পারিনি। সেটা আমারই দোষ হয়েছে। কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি যে ইহাতে তাঁহার অভিমান হবে। সবই বিধিলিপি!—আমার অদৃষ্টের দোষ!'

মাধবদাস চলিয়া গেল। যদুনাথ তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর গিন্নির কাছে গেলেন। তিনি যেন অনেক তপস্যার ফলে আজ একটা কঠোর সত্যের বন্ধনপাশ হইতে অবিচ্ছিন্ন মুক্তি পাইয়াছেন। 'গিন্নি, ওরাই ইচ্ছা

করে সম্বন্ধটা ভেঙ্গে দিলে। আমার কোনও দোষ নেই।'

জীবনকুমারী আজ প্রভাতে শয্যার উপর একটু উঠিয়া বসিয়াছিলেন। সহসা কর্ত্তাকে ঝড়ের মত অসময়ে কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি একটু আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি ব্যাপারটা বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কারা ভেঙ্গে দিলে গো? কি বল যে, আমি কিচ্ছু বুঝতে পারিনি—আর বয়েসও ত হলো।'

য।—লোক পাঠিয়ে মোক্ষদাসুন্দরী খবর দিয়েছেন যে জমীদারের সঙ্গে কুটুম্বিতা করতে তাঁর ইচ্ছা নেই। আমি এখন কি করবো, বল।

জী।—কি আর করবে? ভট্‌চায্যি-গিন্নি নিজেই যখন সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিলেন, তখন লালুর সঙ্গে বিয়ে দেওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। কিন্তু চট্‌পট সেরে ফেল, আর একটুও দেরী কোরো না। আমি সুধার বিয়ের জন্যে ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়েছি।

য।—তুমি যত তাড়াতাড়ির ব্যাপার মনে করছো, আমি তত করিনি। কেন, ওর কি বয়েস হয়েছে, গিন্নি? এক রত্তি মেয়ে, ছেলেবেলা থেকে আমাদের

কাছে মানুষ, বিয়ে হলেই ত শ্বশুরবাড়ী চলে যাবে। আচ্ছা, তখন কেমন করে এই শূন্য বাড়ীখানায় থাকবো, গিন্নি? একে একে ত সকলকেই বিদায় দিতে বসেছি—

স্ত্রী।—অত ভেবো না গো—তুমি অত ভাবলে আমার কি দশা হবে? যে কদিন বেঁচে আছি, সুধার মুখে হাসি দেখে যাই। আর আমার কোনো বাসনা নেই, কর্ত্তা। ওর মা যে চলে যাবার সময় আমার হাত দুখানি নিজের হাতে চেপে ধরে বলে গিছলো, 'মা, এই তোমার একরত্তি নাতনীটি রইল, বুকের রক্ত দিয়ে একে বাঁচিয়ো।' সে কথা যে আমি এখনো শুনতে পাচ্ছি, কর্ত্তা!

যদুনাথ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন।

মাধবদাস মোক্ষদাসুন্দরীর নিকট ফিরিয়া আসিয়া যদুনাথ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা যথাযথ আবৃত্তি করিল। মোক্ষদার বদনমণ্ডলে চিন্তার রেখা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। তিনি মাধবদাসকে কতকগুলি তরীতরকারি উপহার দিয়া বিদায় দিলেন।

মোক্ষদাসুন্দরী ভাবিতে লাগিলেন যে হিরণ্ময় সত্যই সুধারাণীর রূপে ও গুণে মুগ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এখন তাঁহারই আয়োজনে বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল।

অথচ তিনিই একদিন হিরণ্ময়কে জমীদার-বাড়ী পড়াইতে যাইতে অনুমতি দিয়াছিলেন, তিনিই একদিন যদুনাথের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছিলেন। যে আশার বীজ হিরণ্ময়ের অন্তঃকরণে ক্রমশঃ অঙ্কুরিত ও পুষ্পিত হইয়া বিশাল মহীরুহে পরিণত হইয়াছিল, সে বৃক্ষ কেমন করিয়া তিনি এখন নির্ম্মূল করিবেন? তাঁহারই আশায় প্রণোদিত হইয়া হিরণ্ময় ছুটিয়া জমীদার-বাড়ী যাইত, তাঁহারই প্ররোচনায় সে অসাধ্যসাধন করিয়াছে, নহিলে সে কি যদুনাথের বাড়ী যাইবার অনুরোধে নিজ আত্মসম্মানটুকু বিসর্জ্জন দিত? সে কি তেমন ছেলে! কিন্তু এখন তিনি হিরণ্ময়ের জন্য কি করিবেন? সে বিবাহ করিবে না বলিয়াছে। তাহার প্রতিজ্ঞার কঠোরতার কথা ভাবিয়া মোক্ষদা শিহরিয়া উঠিলেন। অনেকক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া তিনি শেষে স্থির করিলেন যে যেমন করিয়াই হউক তিনি হিরণ্ময়কে বিবাহ করিতে রাজী করিবেন।

২০

লালা সাহেবের সঙ্গে সুধার বিবাহ-সম্বন্ধ ঠিক হইয়া গিয়াছে।

যদুনাথের প্রাসাদের বহির্ভাগে একটী সুন্দর পুষ্করিণী আছে, তাহার চারিদিকে সোপানশ্রেণী। এই অবতরণিকা-

গুলির দুই পাশে বসিবার জন্য সুপ্রশস্ত মার্ব্বেল পাথরের আসন আছে। এইরূপ একটী আসনে শিউলি ও সুধারাণী সন্ধ্যাবেলা বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। সুধারাণী এখন বড় হইয়াছে, তাহার মুখ গম্ভীর, তাহার সে পূর্ব্বেকার চঞ্চলতা নাই, সে যেন আজকাল সর্ব্বদাই কি-এক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকে। সুধা শিউলির স্বপ্নালস মুখখানির দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার ভাই বিয়ে করতে ইচ্ছে নাই।'

শিউলি সুধার আরক্ত গণ্ডে অঙ্গুলির দ্বারা ঈষৎ আঘাত করিয়া বলিল, 'আহা, ঐটে বুঝি তোর মনের কথা, সুধা? কেন, বিয়ের কথা শুনে আবার বুঝি লোকের মন খারাপ হয়ে যায়? আমার বিয়ের যখন সব ঠিক হয়ে গেল, তখন বাবা মাকে এসে সব বল্লেন। আমার বুকের ভিতর একটা আনন্দের তুফান জেগে উঠলো। কেবলই ইচ্ছা হতে লাগলো—কতক্ষণে সেই চন্দন-চর্চ্চিত সুন্দর মুখখানি দেখব। কতক্ষণে তার চেলীর বন্ধনে নিজেকে জন্মের মত বেঁধে দোবো! কিন্তু সুধা, পারিনি—আমি যে বড় অভাগিনী, আমার এই ছার রূপই আমার কাল হয়েছে! আমি বড় অভাগিনী বোন্,—কেন তোর কিসের দুঃখ হয়েছে বল্ আমায়।'

'আমার বিয়ে করতে ইচ্ছে নেই—একটুও ইচ্ছে নেই।'

'বিয়ে করবিনি ত কি স্কুলের মিস্ বাবা হয়ে থাকবি?'

'ইচ্ছা হয়—গরীব দুঃখীদের সঙ্গে মিশি। তাদের সুখ দুঃখ আমার নিজের সুখ দুঃখ করে নিই। তাদের আর কেউ নেই দিদি। কেবল আছেন—ভগবান।'

'তুই আজকাল খুব ধর্ম্মকর্ম্ম করতে শিখেছিস্। এ সবও কি হিরুদা তোকে শিখিয়েছিল?'

হিরুদার উল্লেখে সুধার গোলাপীগণ্ডস্থলে সুন্দরতর গোলাপ ফুটিয়া উঠিল। শিউলি ইহা বুঝিতে পারিয়া কহিল, 'আমি বুঝেছি—তোর ব্যথা কোন্‌খানে! বলি—বলি তাহলে?'

সুধা তাড়াতাড়ি উঠিয়া শিউলির মুখে হাত চাপা দিল। শিউলি তাহার বাধা না মানিয়া কহিল, 'হিরুদা তোর মনের সিংহাসন জুড়ে বসে আছে, হিরুদাকে তুই দেবতা বলিস, হিরুদার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেল বলে' তুই অত কাতর হয়ে পড়েছিস। আমি কি আর বুঝতে পারি নি?'

এবার সুধা সত্যই কাঁদিয়া ফেলিল! সে বসনাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া শিউলির কোলে মুখ লুকাইল। শিউলি বড়

সহানুভূতিপরায়ণা। সে-ও কাঁদিল,—অথচ তাহার কান্নার উদ্দেশ্য সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। আকাশ-কোণে কালো মেঘ দেখা দিল—একটা নিবিড় ঝঞ্ঝার পূর্ব্বসূচনা হইল। শিউলি চোখ মুছিয়া বলিল, 'ছিঃ, দিদি, কাঁদতে নেই। তোমার স্নেহময়ী দিদিমার মতের বিরুদ্ধে যাওয়া উচিত নয়। দুঃখের ঘুর্ণিতে পড়ে পড়ে আমি শুধু এই বুঝেছি যে অদৃষ্টের উপর মানুষের কোনো হাত নেই। যা, উঠে যা, দিদিমার কাছে যা। ঐ ঝড় উঠল, যা, দুষ্টু, ওঠ্।' সুধা উঠিল, চোখ মুছিয়া কহিল, 'তুমি কি এখানে একলাটী অন্ধকারে বসে থাকবে? না, দিদি, তুমিও চল। ঝড় উঠল যে।'

'আমার এই ঝড় বড় ভাল লাগে। তুই যা, আমি একটু পরে যাচ্ছি।' সুধা চলিয়া গেল।

রাত্রির আঁধার গাঢ়তর হইয়া আসিল। গভীর অন্ধকারে কিছুই দেখা যাইতেছিল না। কৃষ্ণজটার মত নিবিড় কালো মেঘ আকাশে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল। কালো মেঘের বুক চিরিয়া ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুদ্দীপ্তি প্রকাশিত হইল—শোণিত রেখার মত। কড়্ কড়্ করিয়া বজ্র হানিতে লাগিল, যেন দেবতার নিদারুণ অভিশাপ। শিউলির হৃদয়ও বজ্র দিয়ে গড়া, তাই সে হৃদয় একটু টলিল

না, সে নির্ব্বিকারে প্রলয়ের দেবতার মত সেই সোপান-তটে বসিয়া রহিল। এমন সময় সেই অবিচ্ছিন্ন আঁধারের ভিতর হইতে শ্বেতাম্বর-পরিহিত একটী মনুষ্যমূর্ত্তির অস্পষ্ট ছায়া ফুটিয়া উঠিল। শিউলি দেখিল, কিন্তু একটুও ভয় পাইল না। মূর্ত্তি আরও নিকটস্থ হইল, শিউলি তথাপি অটল। সেই ছায়া সজীব হইয়া শিউলির সম্মুখে আসিয়া কি যেন বলিতে চাহিল। তখন শিউলি সহজভাবেই জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কে গা ?'

মূর্ত্তি বলিল, 'চুপ্, কথা কয়ো না, আমার সঙ্গে এসো।'

শিউলি উত্তর করিল, 'যদি না যাই ?'

মূর্ত্তি দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, 'জোর করে নিয়ে যাবো। আমার সঙ্গে আরও লোক আছে।'

'এখানে তুমি কেমন করে এলে ? চারিদিকে ত বেড়া দেওয়া।

'কেন, বেড়া কি পার হওয়া যায় না ?'

'আমায় কোথায় নিয়ে যাবে ?'

'সে কথা এখন বলবো না।'

'কেন নিয়ে যাবে ?'

তুমি তা কি জান না, শিউলি ? সেই—'

বলিতে বলিতেই মূর্ত্তি ছুটিয়া শিউলির হাত ধরিতে আসিল। শিউলি পাপিষ্ঠা—সে নড়িল না, মূর্ত্তি তাহার হাত ধরিল।

অমনি প্রলয়ঙ্কর বজ্রের উদাত্ত গম্ভীর শব্দে আকাশ বাতাস যেন বিদীর্ণপ্রায় হইল। সমস্ত প্রকৃতি যেন মহাশ্মশানের তাণ্ডবনৃত্যে মাতিয়াছে। দামিনীর ক্ষণিক দীপ্তিতে শিউলি সে মূর্ত্তির বদনমণ্ডল ভাল করিয়া দেখিতে না পাইলেও সে তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিল।

শিউলি স্থিরকণ্ঠে ডাকিল, 'অপূর্ব্ব!'

অপূর্ব্ব এই গম্ভীর আহ্বানে চমকিয়া উঠিল। সে শিউলির হাত ছাড়িয়া দিল।

'এইবার যদি অন্ধকারে পালাই?'

'না, তুমি পালাতে পারবে না, আমার হাতে হাত দিয়ে এই মাত্র শপথ করলে!'

'ওঃ, আচ্ছা চল কোন্ পথে যেতে হবে।'

অপূর্ব্বের পার্শ্বগামিনী হইয়া শিউলি দ্রুতপদসঞ্চারে জমীদারের বাড়ীর সীমানা পার হইয়া গেল। এমন সময় অদূরেই গম্ভীর বজ্রপতনের বিকট শব্দ হইল। চমকিত অপূর্ব্ব শিউলির হাত চাপিয়া ধরিল।

'এত ভয় তোমার?'—শিউলির মুখে একটা পিশাচের

হাসি ফুটিয়া উঠিল। অপূর্ব্ব বিদ্যুতের আলোকে সে হাসি দেখিল,—ক্রূর প্রতিশোধের নিষ্ঠুর হাসি। অপূর্ব্ব আবার শিহরিয়া উঠিল।

২১

পাড়ার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী মহাশয় লালাসাহেবের একজন শুভানুধ্যায়ী বন্ধু। লালাসাহেব অপরিণতবয়স্ক বলিয়া সর্ব্বদাই বিষ্ণুবাবুর পরামর্শ লইত। বিষ্ণুবাবু সেদিন সকালে যখন ডাকিলেন তখন লালাসাহেব বড় বড় কয়টা ব্রিচ্-লোডারের অঙ্গসংস্কার করিতেছিল। লালা কহিল, 'আসুন, দাদা। কেমন আছেন?'

'আর ভাই, অমনি কেটে যাচ্ছে। রাজাবাবুর নাতনীর সঙ্গে তোমার ত বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেল। তোমার বন্ধুবান্ধবদের সব বলা হয়েছে ত হে?'

'আমার বন্ধুবান্ধব কেউ নেই, দাদা। হাঁ—হাঁ, একজন আছে, না—দুইজন। একজন অপূর্ব্ব, আর একজন—'

'অপূর্ব্ব? কোন্ অপূর্ব্ব, দাদা?'

'অপূর্ব্ব সেন—বড় তরফে থাকত, সংপ্রতি আমাদের এখানে উঠে এসেছে।'

'তুমি কোন্ অপূর্ব্বের কথা বলছ? কাল বিকালে যদুবাবু একজন অপূর্ব্বের নাম করেছিলেন। সে না কি তাঁর বাড়ী থেকে একটী মেয়েকে জোর করে নিয়ে গেছে—'

'সে কি?'

'হাঁ, আজ পাঁচ ছয়দিন হলো অপূর্ব্ব বলে একটী ছোকরা তাঁর বাড়ীর ভিতরকার বাগানে ঢুকে সন্ধ্যাবেলা সেই মেয়েটীকে ধ'রে নিয়ে গেছে। মেয়েটী নাকি ভ্রষ্টা ছিল। যদুবাবু তার অসহায় অবস্থা দেখে তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তার আর কেউ নেই। তোমার এই নূতন বন্ধুটী কোথা থেকে এসে জুটলো, শুনি?'

'আমি প্রায়ই সন্ধ্যাবেলা মাঠে গিয়ে স্কেচ করি। সে-ও বেশ ছবি আঁকতে পারে। তার সঙ্গে আমার মাঠেই আলাপ হয়েচে।'

'আচ্ছা, এইবারে একটু সাবধানে চলো, দাদা। তোমার আর একজন বন্ধু কে?'

'আর একজন—তিনি কি নিমন্ত্রণে আসবেন? তিনি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য্য।'

'তার সঙ্গেও তোমার ভাব হয়েছে? কি করে হল?'

'সেদিন ঝড়ের সময় পাড়ায় আগুন ধরে গিছল—একেবারে দশবারখানা কুঁড়ে ঘর ধূধূ করে জ্বলছিল।

বেচারা প্রজাগুলো প্রাণভয়ে চেঁচাচ্ছিল। আমি সে সময় ছুটে ছুটে মাঠ থেকে আসছিলুম। তারপর এই হিরণ্ময়বাবু কোথা হতে ছুটে এসে সেই প্রচণ্ড আগুনের ভিতর ঢুকে অনেকগুলি ছোট ছেলেমেয়ের প্রাণ বাঁচালেন। সেদিন রাত বারোটা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত খেটে ব্রাহ্মণ গরীবদের যে উপকার করেছেন তা আমি জীবনে ভুলব না। আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলুম। সেদিন তাঁর সঙ্গে আলাপ হলো। অতি অমায়িক ভদ্রলোক—'

'তার সঙ্গেই আগে সুধার বিয়ের কথা হয়েছিল, তা বোধ হয় জানো? তা বেশ, আমিও এই ছেলেটীর গুণপনা সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি। দাদাভাই, আমি মনে করছিলুম হিরণ্ময়কে আমাদের ম্যানেজার করলে মন্দ হয় না।'

সুধার সেই স্নিগ্ধ প্রশান্ত অপূর্ব্ব কমনীয় মুখখানি লালার মনে পড়িতেছিল,—সেই দানরতা জগদ্ধাত্রীর অপরূপ রূপ! ত্যাগের এই অভিনব আদর্শে তাহার মন সহজেই সুধার চরণতলে সম্ভ্রম-নত হইয়া পড়িয়াছিল। তাই আর সে একদিন একটাও পাখী শিকার করিতে পারে নাই, তাহার সব গুলিগুলাই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। সে ছবির রেখাও ভাল করিয়া আঁকিতে পারে নাই,—সব

রেখা একত্র সম্মিলিত হইয়া কেবল সুধার মুখখানিই ফুটাইয়া তুলিয়াছিল! তাহার এই প্রেমের ক্ষুদ্র ইতিহাসটী নিপুণ পিতা ইতিমধ্যেই ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন।

অপূর্ব্বের এই অদ্ভুত কীর্ত্তির কথা শুনিয়া সে চঞ্চল ও বিক্ষুব্ধ হইল। লালাসাহেবের জীবন আবাল্যই বিদেশে কাটিয়াছে বলিয়া তাহাতে একটুও ছল ছিল না। পবিত্র হোমশিখার মতই সে বাড়িয়া উঠিয়াছে। সে সেদিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে হিরণ্ময়দের বাড়ী যাইবে। আজ এই অপূর্ব্ব সুযোগ জুটিয়াছে। তাই তাড়াতাড়ি সে 'বাইকে' করিয়া হিরণ্ময়দের তিন ক্রোশ দূরের বাড়ীতে ছুটিয়া চলিল।

বৈশাখের রৌদ্রদগ্ধ মধ্যাহ্ন মাথায় করিয়া সে তীরবেগে বাইক্ ছুটাইয়া মেঠো পথের উপর দিয়া চলিল। নদীর কূলে আসিয়া দেখিল মাঝি খেয়াখানি ও-পারের ঘাটে বাঁধিয়া নৌকার ভিতর রাঁধিতেছে। নদী জোয়ারের জলে কূলে কূলে ভরিয়া যৌবনোদ্ধতা নারীর মত ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার ইঙ্গিতমাত্রেই মাঝি খেয়া লইয়া এ-পারে আসিল। লালাসাহেব বাইক্ লইয়া পার হইল।

ও-পারে কৃষকদের ঘন-সন্নিবিষ্ট কুটীরশ্রেণী; কিছুদূর

অগ্রসর হইলে ভদ্রলোকদের ইষ্টকনির্ম্মিত সুন্দর বাড়ীগুলি রাস্তার ধারে পড়ে। মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে আহারান্তে কেহ হুঁকা হাতে বন্ধুর বাড়ী তাস বা দাবা খেলিতে যাইতেছে; কেহ বা মুড়ি-মুড়কি-পান-বিড়ির দোকানে বসিয়া গল্প করিতেছে; কোনও গৃহস্থের বাড়ীর দ্বারদেশে একটু স্নিগ্ধ ছায়া আশ্রয় করিয়া প্রকাণ্ড একটা কুক্কুর ঝিমাইতেছে; কোথাও বা বাঁশবাগানের পুষ্করিণীতে তালবৃক্ষকাণ্ডের সোপান বাহিয়া একটী লজ্জাশীলা কৃষকবধূ আবক্ষ ঘোমটা টানিয়া কলসী-কক্ষে গৃহে ফিরিতেছে। এই সব স্নিগ্ধমধুর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে লালাসাহেব 'বাইক' ছুটাইয়া চলিয়াছে। সকলে পাড়ায় এই নবাগত পুরুষটীকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে সরিয়া গেল। সে বাইক্ হইতে নামিয়া একটী চাষাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'বাপু, বলতে পার এখানে হিরণ্ময় ভট্টাচার্য্যের বাড়ী কোথায়?'

কৃষকটী মুখব্যাদান করিয়া লালাসাহেবের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। পরে একটু সামলাইয়া কহিল, 'হিরুবাবুর কথা কইছেন? ভটশ্চায্যি-মশায় ত? আইসেন বাবু,—হেই যে দেখছ অশথগাছ আর সান-বাঁধানো পুকুর—ওনার মাঝ দিয়ে ডাইনে গিয়া একরশি উত্তুরে যে খোড়ো ঘর, হোথাকে নেমে জিগ্যেস করলেই

দেখবেন কতটী ছেলে ন্যাকাপড়া করতিছে। হোথাকে দাদাবাবুর ঘর।'

কৃষকদের এই সরল উক্তিগুলি লালাসাহেবের বড়ই ভাল লাগিত। সে গিয়া যথাস্থানে নামিল। ছেলেগুলি হিরণ্ময়ের কাছে পড়িতে আসিয়াছে। কিন্তু হিরণ্ময় তখনো বাড়ী ফিরে নাই। যে পাড়ায় আগুন লাগিয়াছিল, সেই পাড়ায় গিয়াছে। লালাসাহেব হিরণ্ময়ের নিঃস্বার্থ পরোপকারিতায় মুগ্ধ হইল। মোক্ষদাসুন্দরী দরজার আড়াল হইতে তরুণ সুন্দর এই কমনীয় যুবকটীকে দেখিলেন। তাঁহার স্বর্গীয় স্বামী ইহাদের বাড়ীর কুলগুরু ছিলেন। তিনি লালাসাহেবকে চিনিতে পারিলেন। তিনি বাহিরে আসিয়া তাহাকে বাড়ীর ভিতর লইয়া গেলেন। একখানি সতরঞ্চির আসন দাওয়ায় বিছাইয়া দিয়া তাহাকে বলিলেন, 'বসো, বাবা, বসো। হিরু সেই কোন্ ভোরে বেরিয়ে গেছে, বাবা, এখনো ছেলের দেখা নেই। তোমায় বাবা, আমি দেখেই চিনতে পেরেছিলুম। তোমার মুখখানি ঠিক তোমার মার মত। নীহার কতবার আমাদের বাড়ী গুরুদর্শন করতে এসেছে। তুমি তখন জন্মাওনি।'

'আহা, এই রৌদ্রে বাছার মুখখানি রাঙ্গা হয়ে

উঠেছে'—এই বলিয়া একখানি পাখা লইয়া তাহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন। লালাসাহেব অনাস্বাদিতপূর্ব্ব মাতৃস্নেহরসে অভিষিক্ত হইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছিল। কিন্তু তাহার বড়ই লজ্জা করিতেছিল। সে নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া কহিল, 'না—না, আমাকে দিন, আমাকে দিন।'

'আমি কি তোমার পর, বাবা? আগে একটু ঠাণ্ডা হও, তার পর তোমার সঙ্গে গল্প করবো।'

'না, মা, আমি ত এখন আর বসতে পারবো না। আমি হিরণ্ময়বাবুকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছিলাম।'

'কেন গা, কিসের নিমন্ত্রণ?'

'পরশু আমার বিয়ে।'

এ কথা বলিতে লালাসাহেবের একটুও লজ্জা করিল না। কারণ সত্যপ্রকাশ করিতে তাহার কিছুমাত্র চক্ষুলজ্জা হইত না। মোক্ষদাসুন্দরী হাসিয়া বলিলেন, 'তোমার বিয়ে—সে ত যাবেই। কিন্তু, বাবা, আমি তোমায় এখন ছাড়চি না। তুমি একটু বোসো, আমি আসচি।'

লালাসাহেব এতক্ষণে মুখ তুলিয়া চাহিয়া এই নিঃসম্বল পরিবারটীর অদ্ভুত ত্যাগের কথা ভাবিতেছিল। বাড়ীঘরগুলি কেমন অনাড়ম্বরভাবে সজ্জিত ও পরিচ্ছন্ন, সর্ব্বত্রই

যেন একটা পবিত্র লক্ষ্মীশ্রী। সে ত জমিদার—তাহার ভিতর যে ত্যাগধর্ম্ম জাগিতে পারে নাই, তাহা কেমন করিয়া এই নিঃসহায় হিরণ্ময়ের মধ্যে জাগিল? ইচ্ছা করিলে হিরণ্ময় ত ধনে ও মানে বড় হইতে পারিত, কিন্তু সে সহায়ের মুখ চাহিয়া কাজ করে নাই, মানাপমান গ্রাহ্য করে নাই, জমীদারের বাড়ী বিবাহও করে নাই। কিছুই নাই, অথচ সকলেই তার অনুগত বাধ্য ভক্ত। তাহার কয়টা প্রজা তাহাকে এমন করিয়া শ্রদ্ধা করে? আর এই মা—চিরস্নেহবর্ষী, অমিতধীসম্পন্না হিরণ্ময়ের বিধবা মা? এত বড় বিবাহের সম্বন্ধটা স্বেচ্ছায় ভাঙ্গিয়া দিয়াও ত তাহার মুখের হাসি ম্লান হইয়া যায় নাই! পরকে আনন্দ দিয়া, পরের দুঃখ মোচন করিয়াই এই রমণীর আনন্দ। লালাসাহেবের বড় ইচ্ছা হইল তাঁহাকে একবার 'মা' বলিয়া ডাকে।

মোক্ষদাসুন্দরী একটা সাদা পাথরের গ্লাসে তরমুজের সরবৎ করিয়া আনিলেন। লালাসাহেব বিনা বাক্যব্যয়ে তাহা একনিঃশ্বাসে পান করিয়া পরম তৃপ্তি অনুভব করিল। ইতিমধ্যে হিরু আসিয়া লালাসাহেবকে ঘরের দাওয়ায় এমনভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করিল। 'এ কি, লালাবাবু যে? কতক্ষণ? প্রতিজ্ঞার কথা একটুও ভোলেননি তাহলে?'

দুইজনে অনেকক্ষণ গল্প হইল। ক্রমশঃ অপরাহ্ণের রৌদ্র বৃক্ষশীর্ষগুলি সুবর্ণরঞ্জিত করিয়া দিল। হিরণ্ময় যখন লালাসাহেবের আগমনের কারণ শুনিল, তখন তাহার মুখ একটুও মলিন হইল না, হাসির অজস্র ধারা একটুও কমিল না।

২২

সেবার নয়ানপুরে হঠাৎ কলেরার মহামারী উপস্থিত হইল। সকলে বলিতে লাগিল কোনও অজ্ঞেয় কারণবশতঃ নদীর সুপেয় জল অব্যবহার্য্য ও বিষদুষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুধার সহিত লালাসাহেবের বিবাহ হইবার পর হিরণ্ময় যদুনাথবাবুর অনুরোধে লালার জমীদারীর ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই মহামারীর ঝড় যখন এক দিন কালবৈশাখীর সান্ধ্যপ্রলয়ের মত সুবৃহৎ পল্লীটির উপর নামিয়া আসিল, তখন হিরুর জমীদারী কার্য্য দেখিবার জন্য আর একমুহূর্ত্তও সময় রহিল না। দিনরাত মাতা-পুত্রে সেই মারীভয় পীড়িত গ্রামে রুগ্ন ও আসন্ন-মৃত্যুগণের সেবা করিতে লাগিল। এমন সময়ে সংবাদ আসিল—ছোটতরফে হিরুর বাল্যবন্ধু অপূর্ব্ব কলেরারোগে আক্রান্ত হইয়াছে।

মোক্ষদা কহিলেন, 'ও হিরু, সেই বাছাকে ঘরছাড়া করেছিলুম, আবার সে শিউলিকে নিয়ে একটা কেলেঙ্কারি করেছিল--কিন্তু আজ সে মৃত্যুমুখে পড়ে শুসছে, আর তুই কি মান করে ঘরে বসে থাকবি, হিরু?'

'না, মা, ভোরে একবার সেখান থেকে ঘুরে এসেছি। দুপুরবেলা গিয়ে অবস্থা বড় খারাপ দেখে এসেছি। আহা, গরীব মেয়েটার কি হবে—'

'তাকে সঙ্গে নিয়ে আয়, কি হলো খবর নিগে যা।'

'আচ্ছা, মা, চললুম'—এই বলিয়া হিরণ্ময় হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে অপূর্ব্বের বাসগৃহের চারিদিকে একটা অন্ধকার যেন পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। রোগীর গৃহের দ্বারদেশে শিউলি সেন শ্মশান জাগাইয়া বসিয়া আছে। হিরু ডাকিল—'দিদি!'

'কে, হিরুদা? এসেছ?'

'হাঁ—রোগী এখন কেমন?'

'রোগীর সব যাতনা শেষ হয়ে গেছে। এখন আমার কি গতি করবে?'

'তুমি আমার বোন্—ভাই-এর ঘরে আবার ফিরে যাবে। কেমন, রাজী আছ ত?'

শিউলি কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, 'সুধার কাছে আমি অনেক দিন ছিলুম, সে বিপদের সময় আমায় আশ্রয় দিয়েছিল, আমায় তার কাছে পাঠিয়ে দাও।'

এই কথা শুনিয়া হিরণ্ময় কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হইয়া রহিল। মাধবদাস হিরুর সঙ্গে আসিয়াছিল। তাহার সহিত শিউলিকে লালাসাহেবের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া সে অপূর্ব্বের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করিতে চলিল।

সেই ব্যাত্যাবিক্ষুব্ধ সন্ধ্যায় মাধবদাসের সঙ্গে শিউলি যখন লালাসাহেবের প্রাসাদের দেউড়ীতে গিয়া দাঁড়াইল তখন রজনীর প্রথম যাম অতীত হইয়া গিয়াছে। একটী দাসী আসিয়া এই গুণ্ঠনবতী রমণীকে বিস্মিতমনে জমীদার-গৃহিণীর কাছে লইয়া গেল। সুধারাণী তাহার সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে বসিয়া একখানি বই পড়িতেছিল। সহসা শিউলির সুন্দর মুখের উপর কক্ষের উজ্জ্বল আলোক পড়িতেই সুধা শিহরিয়া উঠিল। সে জিজ্ঞাসা করিল—'তুমি—তুমি এখানে? কার সঙ্গে এলে?'

'যার সঙ্গে গিছলুম, সে আর নেই। তুমি অসময়ে আমায় আশ্রয় দেবে বলেছিলে, তাই তোমার কাছে এসেছি। এখন তোমার দয়া।'

'তুমি এখনো বেঁচে আছ? যম কি তোমায় ভুলে আছে দিদি?'

শিউলি হাসিয়া উঠিল—ক্রূর, নিষ্ঠুর, পাষাণময় অধর হইতে যেন মরণের করাল হাসি! সেই হাসির বীভৎস উল্লাসে সুধার বুকের ভিতরটা দুরু দুরু করিতে লাগিল। সে শিউলিকে ডাকিয়া কাছে বসাইল। শিউলি মুখের গুণ্ঠন সরাইয়া সমস্ত ঘটনাটা অকপটে সুধার কাছে বলিয়া গেল। শিউলির সহস্র কলঙ্ক সত্ত্বেও সুধা তাহাকে ভালবাসিত, কেন ভালবাসিত তাহা সে নিজেই জানিত না।

'হাঁ রে, জমীদারবাবুর সঙ্গে তোর খুব ভাব হয়েছে ত?'

'যাও ভাই—তোমার এক কথা!'

'দাদামশাই আর দিদিমা কেমন আছেন?'

'দাদু দিদিমাকে নিয়ে যে কাশী গেছেন—দুটো জমীদারী এখন এক হয়ে গেছে। আর আমাদের একজন ম্যানেজার-বাবু এসেছেন শুনেছিস ত?'

'কে, ভাই?'

'হিরণ্ময়বাবু রে—আমার পণ্ডিত মশাই!'

'ওঃ, তুই এখনো তাঁকে ভুলতে পারিসনি, দেখছি!' শিউলির হৃদয়ে বোধ হয় একটা নৃশংস প্রবৃত্তি ছিল,—নহিলে পরের সুখের মাঝখানে সে ঝড়ের মত আসিয়া পড়ে কেন?

'না—না—না, ও কথা বলতে নেই, বোন'—বলিয়া সুধা শিউলীর মুখে হাত চাপা দিল, এমন সময় 'রাণি! রাণি!' বলিতে বলিতে লালাসাহেব সেই কক্ষে সহসা প্রবেশ করিল। হঠাৎ সম্মুখে যৌবনোদ্ধতা অপরিচিতা শিউলিকে দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার পরিপূর্ণ নিটোল সৌন্দর্য্যের পাশে সুধার কোমল ও সুকুমার সৌন্দর্য্য প্রস্ফুট ফুলের পাশে কোরকের মত দেখাইতেছিল। শিউলি বড় সমস্তায় পড়িল। সে লালাকে দেখিয়া ঘোমটা দিল না, বেশ সপ্রতিভাবে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া পার্শ্বের কক্ষে উঠিয়া গেল।

'ওটী কে গো?'

'তোমার বন্ধু অপূর্ব্ববাবুর সেই—'

'ওঃ, বুঝেছি। তা এখানে?'

'অপূর্ব্ববাবু যে আজ কলেরায় মারা গেছেন। ও আর যাবে কোথায়? আমাকে আপনার মনে করেই এসেছে। ওঃ, তুমি যে একেবারে ঘেমে উঠেছ, কোথায় ছিলে সেই সকাল থেকে?'

'পাখী মারতে জলায় গিছলুম। আহা অপূর্ব্ববাবু মারা গেল!'—সুধা লালার কৃষ্ণকুঞ্চিত কেশদাম লইয়া বালিকাসুলভ খেলা করিতে লাগিল। তাহার গুণ্ঠন খসিয়া

গিয়াছে, মুক্তকুন্তল পিঠের উপর অমাবস্যার নিবিড় আঁধারের মত ছাইয়া পড়িয়াছে, উজ্জ্বল বর্ত্তিকার স্নিগ্ধ আলোক তাহার যৌবনোজ্জ্বল মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

'রেণু, আজ একটাও পাখী শিকার করতে পারিনি। সারাটা দিন যেন স্বপ্নের মত কেটে গেছে। কি যেন একটা দারুণ বিপদ ছায়ার মত আমার সঙ্গে আজ সমস্ত দিন ঘুরে বেড়াচ্চে—'

'ও তোমার মনের ভুল। আমার বুকের বাঁধন থেকে কেউ তোমাকে ছাড়িয়ে নিতে পারবে না জেনো। গাও—আজ তোমার সেই গানটা গাও—ভারি সুন্দর।'

লালাসাহেব হাসিল। সে উঠিয়া গিয়া পিয়ানোর কাছে বসিল। তারপর কোমল কণ্ঠে গাহিল—

'কমলবনের মধুপরাজি
এস গো কমল-ভবনে।
কি সুধাগন্ধ এসেছে আজি
নব বসন্ত পবনে!'

পাশের ঘরে শিউলির চোখ দুটা ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত জ্বলিয়া উঠিল।

২৩

খড়ের ঘরে অরক্ষিত অবস্থায় লোকে জ্বলন্ত আগুন রাখিয়া দেয় না। কারণ সে আগুনের লেলিহান্ শিখা একদিন-না-একদিন সমগ্র ঘরটীকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। শিউলি জ্বলন্ত আগুনের একটা রুদ্র মূর্ত্তি। সরলা সুধা না বুঝিয়া তাহাকে সহোদরার মত আদরে স্নেহে নিজের ঘরে আশ্রয় দিয়াছিল। মাস খানেক পরেই সুধা লক্ষ্য করিল লালাসাহেবের আর সে স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি নাই, আর সে শিকার করিতে যায় না, তার হৃদয়ে সঙ্গীতের উৎস শুকাইয়া গিয়াছে, তাহার অঙ্গে সে শক্তিমান্ যৌবনের স্থিরতা নাই, আর সে উচ্চহাস্য করে না, আর সে ছবি আঁকে না,—এখন সে সারাদিন আনমনে বসিয়া বসিয়া কি ভাবে। এত ভাবনা এতদিন তার কোথায় ছিল?—বৃদ্ধ যদুনাথ নিজের বিশাল জমিদারী নাতনীর নামে লিখিয়া দিয়া চিররুগ্না স্ত্রীকে লইয়া কাশীবাস করিতেছেন। তিনি যখন শুনিলেন লালাসাহেবের অযত্নে সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তখন তিনি হিরণ্ময়কে সমস্ত বিষয়ের রক্ষক নিযুক্ত করিতে মনস্থ করিলেন।

একদিন দ্বিপ্রহরে লালাসাহেবকে একান্তে পাইয়া

সুধা জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার কি হয়েছে গা? আর যে তুমি বড় আমার সঙ্গে কথা কও না?'

'কি কথা কহিব? তোমার সে বন্ধুটীর খবর কি?

'সে এখানে বেশ আছে। পাড়ার ছোট ছোট মেয়েরা তার কাছে পড়তে আসে।'—সরলা সুধা বুঝিতে পারে নাই যে কিসের জন্য স্বামী এত অন্যমনস্ক হইয়াছেন। লালা-সাহেবের প্রাসাদোপম গৃহে শিউলি অবাধ স্বাধীনতায় বনের হরিণের মত ঘুরিয়া বেড়াইত, আর যখন তরুণ জমী-দারের সম্মুখে পড়িত তখনি নিতান্ত সপ্রতিভভাবে মুখে কাপড় দিয়া ছুটিয়া পালাইত। যেন কত লজ্জা! এক-দিন সে লালার পড়িবার ঘরে গিয়া তাহার প্রকাণ্ড বন্দুকগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল। এমন সময় গৃহস্বামীকে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে সহসা পালাইবার পথ না পাইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া যাইবার সময় একেবারে লালাসাহেবের গায়ের উপর পড়িয়া গেল। 'তোমার এত লজ্জা কেন, শিউলি?'—

'তুমি যে আমার বোনের বর, নইলে আর লজ্জা কিসের?'—বেশ উচ্চকণ্ঠে এই কথাগুলি বলিতে বলিতে সে ঘরের বাহির হইয়া গেল। স্তম্ভিত লালার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, সে ভাবিতে লাগিল—নারী এত সুন্দর

কেন? শিউলির কথাটারই বা অর্থ কি? সে যদি তাহার বন্ধুর বর না হইত, তাহা হইলে কি তার লজ্জা করিত না? ইচ্ছা হইল—আবার তাহাকে ডাকে, তাহার সঙ্গে কথা কয়। সে যে পতিতা, লালাসাহেব তাহা ভুলিয়া গেল। সুন্দরী স্ত্রীর কথা, তাহার ভালবাসার কথা—সব সে ভুলিয়া গেল।

সম্প্রতি তাহার দূরস্থ একটী তালুকে প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। অজয়চন্দ্রের মৃত্যুর পর হইতে তাহারা আর খাজনা দেয় নাই। লালাসাহেব হিরণ্ময়কে সঙ্গে লইয়া সেখানে যাইবে স্থির করিয়াছে।

ইতিপূর্ব্বেই হিরণ্ময় দুইটী জমিদারীর সমস্ত কাজ ভাল করিয়া বুঝিয়া লইয়াছিল। অধস্তন কর্ম্মচারীরা কেহই তাহার সম্মুখে কথা কহিতেও সাহস করিত না। সমস্ত কাজ নিজে দেখিয়া তবে হিরণ্ময় তাহার মতামত প্রকাশ করিত। সে পরের কাজে প্রাণ ঢালিয়া দিতে পারিত বলিয়া খুব শীঘ্র লোকের মন জয় করিতে পারিত। লালাসাহেব তাহাকে ঠিক জ্যেষ্ঠ সহোদরের মত শ্রদ্ধা করিত। কতদিন সে তাহাকে বাড়ীর ভিতর নিমন্ত্রণ করিয়াছে, কিন্তু প্রতিবারেই হিরণ্ময় একটা না একটা আপত্তি তুলিয়া এই নিমন্ত্রণ সৌজন্যের সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

তাহার অপূর্ব্ব ত্যাগধর্ম্ম, ভাবমুগ্ধ গৌরকান্তি ও তেজস্বিতা দেখিয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত তাহাকে শ্রদ্ধা করিতেন।

এখন তাহার বাড়ী ঠিক একটা মোসাফেরখানা হইয়া পড়িয়াছে। যে-সব দুঃস্থ প্রজা রুগ্ন, যাহারা খাইতে পায় না, যাহারা সমাজচ্যুত, যাহাদের কেহ দেখিবার লোক নাই,—তাহারা হিরুর গৃহে আশ্রয় লইয়াছে। মোক্ষদা-সুন্দরীর একমুহূর্ত্তও সময় নাই। এই সব অনাথ, আতুর, অক্ষম সন্তানগুলি যে তাঁর বুকের রক্ত।

দু'একদিনের মধ্যে হিরু আসিয়া খবর দিল যে তাহাকে লালাসাহেবের সঙ্গে একবার গোঁসাইপুর তালুকে যাইতে হইবে। সেখানে প্রজারা জমীদারকে খাজনা দিবে না বলিয়া বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একদিন সন্ধ্যায় মোক্ষদাসুন্দরীর হস্তে রোগীদের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া হিরণ্ময় গোঁসাইপুর যাত্রা করিল।

ইতিপূর্ব্বেই লালাসাহেব ও সুধারাণী গোঁসাইপুরে গিয়া সেখানকার সুরম্য বাগানবাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিল। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে বাগানবাড়ীর পশ্চাতে দীঘির সোপানতটে বসিয়া তখন দুইজনে গল্প করিতেছিল। ধূলি-ধূসরিত পদে লালার কাছে আসিয়া হিরণ্ময় তার পাশে সুধাকে দেখিয়া চমকিত হইয়া ফিরিল। সেই দেখা—

আর এই দেখা! সুধারাণীও চাহিয়া দেখিল—সেই স্নিগ্ধ-শ্যাম, তরুণসুন্দর ব্রহ্মচারীর পানে। একদিন সে-ই না তার জীবনের আদর্শ ছিল? সুধা কি সে-সব জীবনে কখনো ভুলিতে পারিবে? সুধার বুকের ভিতরটা একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় আবার কাঁপিয়া উঠিল। লালা হাসিয়া বলিল, 'আসুন হিরুদা, সুধার কাছে আবার আপনার লজ্জা কি? নায়েব মশাইএর কাছে সব শুনলেন ত?'

মুখ নীচু করিয়া হিরু গম্ভীরস্বরে কহিল, 'হাঁ, সব শুনেছি।'

'এদের মধ্যে ক্য়টা মুসলমান গুণ্ডা আমি আসবার পর থেকেই নাকি খুব ক্ষেপে উঠেছে। দেউড়ীতে কড়া পাহারা দেখে এলেন ত।'

হিরু বলিল, 'এঁদের এনে আপনি ভাল করেননি। পথে অনেক মুসলমান এই কাছারীবাড়ী আক্রমণ করবে শুনে এলুম।'

সম্বন্ধবিপর্য্যয়ে নিতান্ত পরিচিতাকেও 'এঁদের' বলিয়া ডাকিতে হয়। কেন, হিরু কি সুধাকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে? ভুলিয়া গেলেই বা!—সুধা কি ভাবিতে লাগিল।

'আসবার জন্য যে বড় ব্যস্ত হয়েছিল। এখন আমার

ভুল বুঝতে পারছি। সঙ্গে জন পঁচিশেক পাইক এসেছে, পিস্তল বন্দুকও এনেছি।’

‘পিস্তল—গোলাগুলি ?’ হিরু উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। লালা কিছু বুঝিতে না পারিয়া শুধু চাহিয়া রহিল।

হিরণ্ময় আর একবার সেই নতবদনার দিকে চাহিল। এই ত সে দিনের কথা! সুধা তখন কত ছোট ছিল! আর আজ সে জমীদারের গৃহিণী!

গায়ে মলিনতা লাগিলে লোকে যেমন বিশেষ সতর্কতা সহকারে তাহা শীঘ্র ঝাড়িয়া ফেলে, হিরণ্ময় সেই সব পুরাণো কথা তেমনি সহজে মনের পট হইতে মুছিয়া ফেলিল।

২৪

পরদিন সন্ধ্যাবেলা লালা ও হিরণ্ময় উপরের একটা ঘরে বসিয়া কাগজপত্র দেখিতেছে। গ্রামে অজন্মা হইয়াছে, প্রজারা ‘মরিয়া’ হইয়া উঠিয়াছে। ইতিমধ্যে জমীদারের গোমস্তা আসিয়া খাজনা আদায়ে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। এ গ্রামে অনেক দুর্দ্দান্ত মুসলমান প্রজা আছে, তাহারা বহুপূর্ব্বে যদুনাথের প্রজা ছিল, কিন্তু শেষে

ঐ তালুক নিলামে উঠিলে লালাসাহেবের পিতামহ তাহা ক্রয় করিয়া লন। প্রজারা কিন্তু তাঁহাকে কখনই মনীব স্বীকার করিতে যাইত না, প্রতিবারেই খাজনা আদায়ের সময় একটা-না-একটা গোলযোগ বাঁধাইয়া বসিত।

সন্ধ্যার প্রথম যাম অতীত হইয়া গিয়াছে। বাগান-বাড়ীটা প্রকাণ্ড। উপরে উঠিবার দুইদিকেই সিঁড়ি। সিঁড়ির কাছেই লাঠী হাতে পাইকেরা থানা দিতেছে, এমন সময় শতকণ্ঠের একটা ভীষণ চীৎকার উঠিল। লালা চমকিত হইয়া ছুটিয়া গিয়া টেবিলের উপর হইতে পিস্তলটা লইল ও হিরণ্ময়ের হস্তে দিল। সহসা একেবারে চল্লিশ পঞ্চাশজন লোক উপরের ঘরে লাঠী ও সড়কী হস্তে প্রবেশ করিল। চারিদিকে একটা ভয়ানক কোলাহল উঠিল।

লালা কহিল, 'তোমরা কি চাও স্পষ্ট বল, নইলে কেন প্রাণে মারা যাবে?'

হিরণ্ময় ততোধিক অবিচলিতস্বরে কহিল, 'ভাই সব, তোমরা কি জীবনে হত্যার কাজটাই শিখেছ? মানুষ হবার পথটা কি তোমাদের জানা নেই? তোমরা কি এখানে জমীদারকে খুন করতে এসেছ? তা যদি এসে থাক, এসো—এই আমি আগেই তোমাদের সড়কীর কাছে বুক পেতে দিচ্ছি। আগে আমায় মেরে তারপর তোমা-

দের যা খুসী কর।' এই বলিয়া চাদরের ভিতর পিস্তলটা লুকাইয়া বাস্তবিকই হিরণ্ময় সেই যুধ্যমান মুসলমানদের সমক্ষে মুক্তবক্ষে দাঁড়াইল। তাহার সেই মহেন্দ্রপ্রতিম-কান্তি ও বিপুল সাহস দেখিয়া বিদ্রোহী প্রজার দল যেন মন্ত্রাহত হইয়া দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া পড়িল। দরাফ্ খাঁ বলিল, 'হুজুরের কাছে আমরা কখনো ন্যায়বিচার পাইনি। হুজুর আমাদের সুখদুঃখ কখনো দেখেননি; নায়েব মশাই আমাদের ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছেন, আমাদের জরু গরু সব কেড়ে নিয়েছেন, খাজনার দায়ে আমাদের জমি-জমা ক্রোক করে' নিয়েছেন। আর—'

হিরণ্ময় বাধা দিয়া কহিল, 'ভাই সকল, এখন কি তোমরা এখানে ডাকাতি করতে এসেছ? তোমাদের সে নায়েব মশাই এখন আর নেই, জমীদার স্বয়ং তোমাদের অবস্থা চোখে দেখবার জন্য তোমাদের গ্রামে আজ অতিথি হয়েছেন। অতিথিকে কি তোমরা আজ সস্ত্রীক খুন করে প্রতিশোধ নিতে চাও? না, তোমাদের অভাব অভিযোগ সব জানিয়ে তার প্রতিবিধান করতে চাও? যদি উপায় করতে চাও, ত তোমাদের দু একজন মোড়লকে এখানে রেখে আর সকলে ঘরে ফিরে যাও।' তাহার দক্ষিণ হস্তের সেই নির্ভীক ও কঠোর ইঙ্গিতে দুর্দান্ত প্রজারা একেবারেই

নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল। হিরণ্ময়ের সব কাজেই একটা গভীর প্রাণশক্তি বিপুলছন্দে বাজিয়া উঠে, সেখানে যেন সকল অহঙ্কার ডুবিয়া যায়! তাই দীনু মিঞা বলিল, 'হাঁ হুজুর, আমরা এখনই ঘরে চলে যেতে রাজী আছি—যদি আপনি এর প্রতীকার করেন।'

লালাসাহেবের গোলাগুলি যাহা করিতে পারে নাই, হিরণ্ময়ের একটী মৃদু ইঙ্গিত চকিতে সেই কার্য্য নিষ্পন্ন করিল। হিরণ্ময়ের চরিত্রের দৃঢ়তা দেখিয়া সে মুগ্ধ না হইয়া পারিলনা। তাহার নিজের দৈহিক ও মানসিক শক্তির যে অটল গর্ব্ব ছিল, আজ তাহা এক দণ্ডেই বিচূর্ণ হইয়া গেল! পূর্ব্বকৃত সিদ্ধান্ত এইরূপে মিথ্যায় পরিণত হইলে মানুষের আত্মগর্ব্ব সাধারণতই আহত হয়। আজ তাহার হিরণ্ময়ের উপর হিংসা হইল ক্রমাগত হিরণ্ময়ের আশে পাশে থাকিয়া তাহার নিজের চরিত্রগৌরব যেন ম্লান হইয়া গিয়াছে! তাই প্রজারা যখন জমীদার-ভবন ছাড়িয়া চলিয়া গেল, তখন লালা কহিল, 'আপনি ওদের ভালো কথায় তাড়ালেন, কিন্তু ওদের অন্যায় আবদার সইবে কে?' হিরণ্ময়ের আবার সেই হাসি!—সেই প্রাণখোলা, উচ্চ, সরল, আনন্দময় হাসি! সে হাসি সমস্ত মিথ্যা সংশয়, দ্বিধা, মানসিক কলঙ্ক, দীনতা ও কূটবুদ্ধি যেন নিমেষে

উড়াইয়া লইয়া চলিয়া যায়। আহত গর্ব্বের ক্ষোভের উপর এই বিপুল পুলকতরঙ্গ যেন ঘৃতে আহুতি প্রদান করিল। তাহা হইলে হিরণ্ময়ই জমীদার, আর লালাসাহেব তার দীন অনুচর মাত্র?—আর সে সহিতে পারিলনা।

'হীরুদা, বিপদের সময় আমার আমোদ ভাল লাগেনা। আজ যদি সত্য সত্যই একটা রক্তারক্তি হতো তাহলে—'

হিরণ্ময় এ কথায় আবার হাসিল। সে কহিল, 'রক্তারক্তি? আমি থাকতে?—না, সাহেব, আপনার সে ভয় নেই।'

'অত বিশ্বাস নিয়ে আমি ত নিশ্চিন্ত থাকতে পারিনি। আমি কালই চলে যাবো—আপনি সব গোল মেটাবেন।' এই বলিয়া সে ক্রুদ্ধভাবে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। তাহার এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে হিরণ্ময় স্তম্ভিত হইয়া গেল। আজ তাহার মনের সব চিন্তাসূত্রগুলি ঊর্ণাজালের মত দমকা ঝড়ে যেন ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। সে মনে করিয়াছিল—লালাসাহেব তাহার সঙ্গে ভাই-এর মতই ব্যবহার করিবে, কিন্তু আজ তার মনে হইল যে সে চাকরমাত্র, আর লালাসাহেব তার প্রভু। কোনও বিষয়ে তার স্বাধীন মতামত নাই। আজ লালাসাহেবের সব ক্রোধটা তার উপর গিয়া পড়িল কেন? সে কি নিজের অজ্ঞাতে কোন দোষ

করিয়া ফেলিয়াছে? জীবনের উপর তার ত আর কোনই আস্থা নেই—সে জগতে সেবার ভার লইয়া আসিয়াছে, তার জীবন শুধু তারই জন্য নয়, পাঁচ জনের জন্য। কিন্তু জীবনে সে যে অন্যায়ের প্রতিশোধ লইতে শেখে নাই, আঘাতের প্রত্যাঘাতও সে জানেনা। আজ এই বিদ্রোহী প্রজাদের শাসন করিতে গিয়া সে কি নিজের জীবনের আদর্শটাই বদলাইয়া ফেলিবে? না—না—না। তবে? তবে কেন লালাসাহেব অমন ভ্রূভঙ্গী করিয়া চলিয়া গেল?

সহসা দ্বারপথে অলঙ্কার-শিঞ্জিনী শুনিয়া হিরণ্ময় ফিরিয়া দেখিল। একি—এ কোন্ মহিয়সী রমণী শান্তসুন্দর আনত-বদনে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে? এ ত—সুধারাণী! সে—সে এখানে কেন? হিরণ্ময়ের হৃদয়ের ভিতর একটা পাগল ঝড় উঠিল, যেন কোনও দিকে কূল না পাওয়ার মত ভাব। কতদিনের কথা সে? এরই মধ্যে সুধা এত বড় হইয়াছে? লালাসাহেব বোধ হয় তাকে খুবই ভালবাসে—

'পণ্ডিত মশাই!'

তাহার রূপোজ্জ্বল মুখখানি আনন্দে, কৃতজ্ঞতায় বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। কিন্তু হিরণ্ময়ের আজ তাহার কাছে একটুও লজ্জা করিলনা। ঐ অনেক কালের পুরাতন

আহ্বানে সে বড় আনন্দিত হইল। সে কহিল—'কি বলবে, বোন্, আমায়?'

'আজ আপনি আমাদের বাঁচিয়েছেন—সে কথা আমি সারা জীবনেও ভুলতে পারবোনা।'

'আমি বাঁচাইনি, দিদি, ভগবান আমাদের মাথার উপর রয়েছেন, তিনিই বাঁচিয়েছেন। যাও, দিদি, বাড়ীর ভিতর যাও।'

হিরণ্ময়ের মনের জোরে বোধ হয় পাষাণও টলিয়া যাইত। তাহার এক একটা ইঙ্গিত বজ্রের মত শক্তি লইয়া লোকের মন বিচলিত করিত। সুধারাণী হিরণ্ময়ের এই আদেশে মন্ত্রমুগ্ধবৎ গৃহের ভিতর চলিয়া গেল। সুধারাণীকে ব্যস্তসমস্ত দেখিয়া লালাসাহেব জিজ্ঞাসা করিল, 'কি গো, গিন্নি, কোথায়?'

'হিরুদার কাছে গিছলুম।'

'তুমি কি এখনো হিরুদার সঙ্গে কথা কও? এ ভারি অন্যায় তোমার! এখন তুমি না বড় হয়েছ? এখন আর কি তার সমুখে বার হওয়া ভাল দেখায়?'

'আমি তাঁকে দেবতা বলেই জানি! দেবতার চরিত্রে কি দোষ থাকে?'

'পাগল! নারীর স্বামীছাড়া অন্য দেবতা জগতে নেই। এ কথা তুমি জানোনা?'

'ওগো, তোমার দুটী পায়ে পড়ি, আমায় ও উপদেশ দিও না। ও উপদেশ দিলে মনে হয়—তুমি আমায় সন্দেহ কর।'

'আমি তোমায় আদেশ করছি—তুমি হিরুদার সঙ্গে কথা কয়োনা। তাহলে আমি রাগ করবো।'

'তোমার আদেশ আমার মাথার মাণিক। কিন্তু—'

'না, এর ভিতর আর 'কিন্তু' নেই।'

সুধারাণীর সুন্দর মুখের স্নিগ্ধ জ্যোতি ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া গেল। সহসা লালা কহিল, 'না, রাণী, আমায় তুমি ক্ষমা করো—ক্ষমা করো, আমি ভুল বুঝেছি, তুমি হিরুদার সঙ্গে কথা কয়ো। ওঁর সঙ্গে দুদণ্ড কথা কহিলে বুকের ভিতর মস্ত বড় একটা তোলপাড় হয়ে যায়। বল, আমার উপর রাগ করোনি?'

'না, গো, না, আমায় শুধু ভালবেসো, আর আমি কিছুই চাইনি। আমায় বাঁচিয়ো—বাঁচিয়ো।'

এই বলিয়া সে স্বামীর কণ্ঠবেষ্টন করিল। নিতান্ত অসহায় অক্ষম অবস্থায় মগ্নপ্রায় ব্যক্তি যেমন উদ্ধারকারীকে বিপন্ন করিয়া জড়াইয়া ধরে, এ যেন ঠিক সেই রকম ভাব।

২৫

'সে কি, হিরু, তুই কাজ ছেড়ে দিয়ে এলি ?'

'হাঁ, মা, লালাসাহেবের কাছে আর আমার দাসত্ব করা পোষাবে না। আজ আমায় অনেক কথা শুনে আসতে হয়েছে! লালা কারুকর্ম্ম দেখেনা বলে যদুবাবু নিজের তালুক দেখাশোনা করবার ভার আমার উপর দিয়েছিলেন। সেইটাই হয়েছে তার বিষম ক্রোধ। আমি পরের কাজে নিজেকে এত জড়িয়ে ফেলেছি, মা, যে এক এক সময় বড় দুঃখ হয়।'

'যেখানে তোর মনকে নীচু করে থাকতে হবে, সেখানে কুকুরের মত ল্যাজ নেড়ে দাসের মত মনিবের পিছনে ঘুরে বেড়াতে হবে—আমি কি তোকে সে কাজ কখনো করতে বলেছি ? ছেড়ে দিয়েছিস্, বেশ করেছিস্। তোর ভাবনা কি, হিরু ? চাষারা সব তোর ভাই, তাদের দুঃখে তুই যখন বুকের রক্ত দিয়ে সেবা করিস্, তখন তারাও কি তোকে দেখবে না ? কেউ না দেখে উপরে ভগবান কোটীচক্ষু হয়ে আমাদের সবাই-এর পানে চেয়ে আছেন, তিনিই আমাদের দেখবেন। ভয় নেই, হিরু।'

'ভয় ? ভয় কাকে বলে জানিনা, মা। লালার গায়ে

অসুরের মত জোর আছে। সে মনে করে যে সমস্ত পৃথিবীটা একটা মস্ত বড় কুস্তির আখড়া, এখানে গায়ের জোরে লোককে হটিয়ে দিতে পারলেই খুব বড় হওয়া যায়। তা কি যায়, মা? গোঁসাইপুর তালুকের প্রজারা সড়্‌কী নিয়ে যখন জমীদারকে মারতে এল, জমীদার মহাশয় তখন 'যুদ্ধং দেহি' বলে' বড় বড় বন্দুক এনে তাদের বুকের কাছে ধরলেন। ও-পারের মল্লিকবাবুদের সঙ্গে একটা বড় চর নিয়ে মামলা বাঁধলো, লালাবাবু অমনি ফৌজ সঙ্গে করে নিয়ে মল্লিকবাবুদের কুঠী আক্রমণ করতে ছুটলেন,—আমি কত বুঝিয়ে সে ঝগড়া মেটালুম। এমন করে কি জমীদারী করা চলে, মা?'

'কই, লালা ত এমন ছিলনা! সুধা কেমন আছে?'

'ভালই আছে, মা। তবে আমার যেন মনে হয় ওদের ভিতরে ভিতরে একটা দারুণ মনোবিবাদ চলেছে। লালাসাহেব আর বাড়ীর ভিতর যায় না, অনেক সময় কলিকাতার বন্ধুবান্ধব নিয়ে বাইরে অনেকদিন ধরে বেড়িয়ে আসে, আর বাড়ীতে ফিরে এলেই শুনতে পাই গরীব মেয়েটার উপর নানারূপ অত্যাচার করে।'

'সে কি রে? বুড়ো ঠাকুরদাদা এমন ভালো দেখে বিয়ে দিলে, আর তার ফল হল এই!'

'মা, নবগোপাল দাদার বাড়ীর খবর কি?'

'আহা, বউটার কষ্ট দেখলে পাষাণও গলে যায়! নবগোপাল ত এখন শয্যাশায়ী হয়ে পক্ষাঘাত রোগে ভুগছে। মরলেই এখন তার সব জ্বালা জুড়োয়। ধনঞ্জয়ের শোকে বুড়ো প্রাণে মরতে বসেছে। সেদিন আমি দেখতে গিছলুম। কি রকম শূন্যদৃষ্টি হয়ে গম্ভীর মনে সে সারাদিন বসে থাকে, আর যে যায়, তাকেই জিজ্ঞাসা করে, 'কি বাবা, ধনা এলি?'—বউটা শুধু কাঁদে। আহা শ্বশুরটা মরে গেলে বউটার যে কি দশা হবে, ভাবতেও প্রাণটা হুহু করে ওঠে!'

'এখন কি করা যায়, মা, বলে দাও। আর আমি পারি না। যে কাজেই হাত দিয়েছি, সব পণ্ড করে এসেছি।'

'সে কি, হিরু? কোন কাজটা তোর পণ্ড হয়েছে, বল দেখি? সব কাজই ত ভাল মনে করেছিস, তবে তোর ভাবনা কি, বাবা? বুকে বল না থাকলে কি সংসারে দাঁড়ানো যায়? প্রাণে আগুন জ্বালিয়ে রেখে দে রে—কোন কাজেই অমন দিশেহারা হয়ে পড়িসনি। তুই এক কাজ কর। পাড়ায় যে-সব গরীব-দুঃখী আছে, তাদের নিয়ে নীলু ঘোষের আবাদের কাজে লাগিয়ে দে। প্রকাণ্ড

দুশো বিঘে আবাদ তার নদীর পাড়ে, সেই জমীটা তুই জমা নিয়ে সেখানে একটা স্কুল ও একটা হাঁসপাতাল খুলে দে। এই সব চাষাগুলো চিরকাল ধরে নিজের বুক দিয়ে, প্রাণ প্রাণ দিয়ে, সর্ব্বস্ব দিয়ে যে আমাদের ক্ষুধায় অন্ন জুগিয়ে আসছে, এরা কি আমাদের কাছ থেকে কিছুই পেতে পারে না? আমরা কি তাদের কেউ নয়? তাদের কি কিছুই পাওনা নেই রে? আর—'

'আর কি বলছ, মা?'

'আমি সেদিন পতিত গোঁসাই-এর বড় মেয়েটীকে দেখে এলুম। রূপে গুণে মেয়েটা যেন লক্ষ্মী। পতিত গোঁসাই সাহাপুর চতুষ্পাঠীর পণ্ডিত। মেয়েটীকে নিজের হাতে সংস্কৃত পড়িয়েছেন। কি চুল, কি রং, কি টানা চোখ—'

'ঐ—কালিদাসের মত রূপ বর্ণনা আরম্ভ করলেন! না, মা, ঐটী হবে না, আমি বিয়ে করতে পারবো না। আমার সব এত ছেলেপুলে—তাদের নিয়ে তোমার আশীর্ব্বাদে আমার বেশ কেটে যাবে। আর তুমি যে আবাদটার কথা বললে আমি ওখানে তুলার চাষ করবো। আমাদের যে পরবার কাপড় নেই মা! পেটের আর পিঠের জ্বালায় আমরা যে দিন দিন মরে যাচ্ছি। ঐ আবাদটা নিয়ে দেখি যদি কিছু করতে পারি।'

'হিরু, তোর মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কোনো দিন কোনো কথা বলিনি—আজও বলবো না। কিন্তু এমনি করে কি বংশটা লোপ করবি? পিতৃপিতামহ কি এক গণ্ডূষ জল পাবেন না? হিন্দুর ছেলে হয়ে তুই—'

'মা, এতদিন শুধু এই বুঝেছি—বিয়ে করলেই বংশ থাকে না, মা। বরঞ্চ যারা বিয়ে না করে পরের ছেলে মেয়েকে আপনার করে নিয়ে থাকতে পারে, তাদেরই যথার্থ বংশ থাকে।'

'হাঁ হরু, ও কথার উত্তর আর আমি দিতে পারবো না। আর আমি বিয়ের কথা তোকে বলবো না, বাছা।'

—মাতাপুত্রের এই সংকল্পের ফলে সাহাপুরের প্রকাণ্ড আবাদে হিরণ্ময় একটা নূতন উপনিবেশ স্থাপন করিল। নানাদেশ হইতে সে তাঁতী ও জোলাদের আনিয়া জায়গা ইজারা দিল। কার্পাসের গাছ রোপণ করিয়া সেখানে তাহাদের জন্য কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিল। গ্রামের দীন-দুঃখী ও নিরন্নগণ এই নূতন প্রতিষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিল। এইবার হিরুর পর-সেবা, দেশ সেবায় পরিণত হইল। সমুদ্রের লবণাক্ত বাতাস যেমন উপকূলবর্ত্তী দেশ-সমূহে অপূর্ব্ব স্বাস্থ্যসম্পৎ আনয়ন করে, হিরুর এই নূতন

জীবনসংস্কার সমস্ত পাড়াটার মধ্যে একটা বিচিত্র গৌরব আনয়ন করিল। যাহারা বৃদ্ধা তাহারা চরকা-সহযোগে সুতা যোগাইতে লাগিল; যাহারা সমাজে পতিতা তাহারা তাহাদের দৈহিক শক্তি লইয়া চাষের ও বস্ত্রবয়নের কাজে লাগিল; যাহারা যুবক, তাহারা আরও কষ্টসাধ্য কাজে লাগিল। এইরূপে সকলের সমবেত চেষ্টার ফলে গ্রামে একটা নূতন তেজ, নূতন হাওয়া বহিল।

২৬

চোখের উপর যখন স্বামীস্ত্রীর পবিত্র প্রেমলীলা অভিনীত হইত, তখন শিউলির মনটা সেই অনাস্বাদিত সুখলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িত। ভগবান যে তাহাকে নিতান্তই অভাগিনী করিয়া গড়িয়াছেন, সুখলাভে যে তাহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে—এ কথাটা সে কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারিত না। যে ন্যায্য দাবী হইতে সে নিষ্ঠুর ভাগ্যের দ্বারা চিরতরে বঞ্চিত হইয়াছে, সেই দাবীটাকে সে প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিল। সুধা বুঝিতে পারিল যে এইবার তার কপাল ভাঙ্গিয়াছে; যে বিষতরু সে নিজেই রোপণ করিয়াছে, আজ তাহা সে কেমন করিয়া আবার কাটিয়া ফেলিবে? শিউলি অতিথি বেশে প্রথমে

আসিয়া তাহার সমস্ত সুখ ও শান্তি যেন রাহুর মত গ্রাস করিয়া ফেলিল। শিউলির রূপের প্রখর জ্যোতিতে তাহার কমনীয় ও স্নিগ্ধরূপ ম্লান হইয়া গেল। একদিন সে শিউলিকে আর স্বামীর কাছে বাহির হইতে বারণ করিয়াছিল; তখন শিউলি বলিয়াছিল 'ঘরের জিনিষ সামলাওনা ভাই,—আর আমায় যদি অমঙ্গল মনে করো ত বিদায় হয়ে যাই।' ইহার উপর সুধা আর কোনও কথা কয় নাই।

একদিন প্রসাধনরতা শিউলি একটী ঘরে বসিয়া আছে—এমন সময় সহসা সেখানে লালাসাহেব প্রবেশ করিল। ত্রস্তভাবে শিউলি অসংযত বসনসম্ভারে আত্মসংবৃত হইয়া কহিল, 'এ আপনার ভারি অন্যায় কিন্তু! আমায় আশ্রয় দিয়ে—'

লালাসাহেব হাসিল; সে বলিল, 'আমার কাছে আবার তোমার লজ্জা কিসের? আমার সঙ্গে তুমি কথা কও না কেন, শিউলি? আমি কি এতই নীচ?'

এই সামান্য ঘটনার পর হইতে দুজনের ভিতরে পরস্পরের আকর্ষণ বাড়িয়াই গিয়াছে। যে স্রোত বাধা পায় না, তাহা নদীর দুই পাড় ভাঙ্গিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া ছুটে। আবার সেই স্রোতে বাধা পড়িলেও তাহা

কিছুদিনের মত নিরুদ্ধ থাকিয়া প্রবলতর পরাক্রমে সব বন্ধন নিমেষে টুটিয়া ভীমবেগে দুইকূল পরিপ্লাবিত করিয়া ছুটে। লালাসাহেবের অবৈধ প্রেমও প্রথমে বাধা পাইয়াছিল। কিন্তু সে বাধা আত্মশক্তির উপর নির্ভর করে নাই বলিয়া ইহাই তাহার পরাজয়ের কারণ হইল।

প্রভাতে লালা বেশ পরিবর্ত্তন করিতেছে দেখিয়া সুধা ছুটিয়া আসিয়া কহিল, 'কোথায় যাবে এখন ?'

'তোমার সে খবরে দরকার কি ?'

'তোমার কোন বিষয় কি আমার জানবার অধিকার নেই ? কোথায় যাবে বল ?'

'আমি একবার গোঁসাইপুর যাবো। সেখানে আজ পিক্-নিক্ হবে, আজ আর আমি আসতে পারবো না।'

'না, সেখানে গিয়ে কাজ নেই। রাত জাগলে তোমার শরীর খারাপ হবে।'

'আচ্ছা, তুমি আমার সকল কাজে আজকাল অত সন্দেহ কর কেন ? কই আগেত এমন ছিলে না। কেন, আমি কি চোর, না ডাকাত, না খুনা আসামী ?'

'এখন সব কাজই তুমি আমায় লুকিয়ে কর। আগে একদণ্ড আমায় না দেখতে পেলে কি অনর্থ করতে, এখন

আমি দূরে দূরে থাকলেই তুমি বেশ ভাল থাক। আগে আমায় না জিজ্ঞাসা করে কোনো কাজই করতে না, এখন নিজের মনে যা-খুসী তা-ই কর। আর রাত্রে বাড়ীর ভিতর আসো না, আর আমায় আদর কর না, আমি কেমন আছি, তা পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা কর না। আমি যদি তোমার বাধা হয়ে থাকি ত আমায় সরিয়ে দাও—সরিয়ে দাও—'

এই বলিয়া সুধা কাঁদিয়া ফেলিল। ছেলেবেলা হইতে সে বড় অভিমানী, কেহ কিছু বলিলে সে তাহা সহিতে পারে না। তাহাকে আজীবন কেহ কখনো তিরস্কার করে নাই বলিয়া সামান্য তিরস্কারেই তাহার যেন মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিত! তাহার এই নীরব ক্রন্দন দেখিয়া লালাসাহেব একটুও বিচলিত হইল না, সে প্রসাধন শেষে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। একখানা সোফার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া সুধা উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে কাঁদিয়া ফেলিল।

শিউলি যে ইতিমধ্যে লালাসাহেবের গোঁসাইপুর বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছে, তাহা সুধা জানিত না। আজকাল সুধার দিনরাত বুকের মাঝে যেন একটা বাড়বানল জ্বলে—কি দোষে সে স্বামীর পর হইয়া গেল? শিউলির রূপের মোহ কি এতই প্রবল? দরিদ্র যুবক হিরণ্ময়ের

গৃহেও ত শিউলি দীর্ঘকাল ধরিয়া ছিল, কিন্তু সত্যপ্রিয় হিরণ্ময়ের চরিত্রের বিরুদ্ধে কেহ কি একটা কুটিল ইঙ্গিতও কখনো করিতে পারিয়াছে? হবিষ্যাশী, অনাড়ম্বর, সরলহৃদয়, দৃঢ়চরিত্র সেই ব্রাহ্মণসন্তান শিউলিকে সর্ব্বস্ব দিয়া বাঁচাইয়াছিল, তাহার স্নেহময় দাদামহাশয়ও শিউলিকে আশ্রয় দিয়াছিল,—কিন্তু অকৃতজ্ঞ পাপিষ্ঠা শিউলি আজ তার গৃহে যে প্রেমাভিনয় করিতেছে, ইহাই কি তার পুরস্কার? এতদিন সে শিউলির কোনো সংবাদ লইতে পারে নাই, আজ সে স্থির করিল যে সে-ই যখন এ বাড়ীর কর্ত্রী, তখন এই ভ্রষ্টা নারীকে আর কেহই সেখানে আশ্রয় দিতে পারিবে না। কিন্তু দাসদাসীগণের নিকট সে যখন শুনিল যে শিউলি আজ পাঁচদিন হইল গোঁসাইপুরের বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছে, তখন তাহার ক্ষোভের সীমা রহিল না। সে শুধু বলিল, 'ভগবান্, আমায় বাঁচাও!'

লালার দুর্দ্দমনীয় লালসার মুখে শিউলি আসিয়া পড়ায় সে আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। ভ্রষ্টানারী কখনো বিবাহিতা নারীর সুখ সহিতে পারে না, তাই শিউলি লালাসাহেবের শান্তিময় গৃহে আগুন জ্বালাইয়া দিল। গোঁসাইপুর তালুক হিরণ্ময়ের চেষ্টায় এখন বেশ শান্তভাব ধারণ করিয়াছে, সেখানকার নব-সংস্কৃত বাড়ীটিও বেশ

নির্জ্জন। শিউলিকে সেখানে পাঠাইবার পর লালা প্রত্যহ সেখানে যাইত, রাত্রে আর নয়ানপুরে ফিরিত না। এখন তাহার অনেক বন্ধু জুটিয়াছে, তাঁহার জমীদারী এখন আবার সেই পুরাতন নায়েবটীর হাতে গিয়াছে। কোনো বিষয়ে অর্থের কার্পণ্য করা তার স্বভাব ছিল না, তাই সে ধূলিমুষ্টির মত অজস্র অর্থ অকাতরে ব্যয় করিতে লাগিল।

সেদিন দ্বিপ্রহরে সুধা অধরদাসকে কহিল, 'দাদু, একবার পণ্ডিত মশাইকে খবর দিতে পারো? আমার বিশেষ দরকার।' অধরদাস হিরুকে গিয়া সংবাদ দিতে বড় ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। পূর্ব্বে কাজের খাতিরে সে লালাসাহেবের বাড়ীতে আসিতে কোনই সঙ্কোচ বোধ করিত না, কিন্তু আজ সে কি বলিয়া এই তরুণী পুরস্ত্রীর আহ্বানে নির্জ্জনে তাহার সহিত দেখা করিবে? মোক্ষদাসুন্দরীকে সব কথা বলিতে তিনি বলিলেন, 'সে নিশ্চয়ই কোনো বিপদে পড়েছে,—তোর মনে যখন কোনো পাপ নেই, তুই যাবিনি কেন রে?'

সন্ধ্যায় দাসীর সঙ্গে সুধার নিকট গিয়া কহিল, 'দিদিমণি, আমায় ডেকেছ?'

'পণ্ডিত মশাই, আপনি ত আমাদের সব কথাই

জানেন,—আমার জীবন এখানে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। আমি পুরানো বাড়ীতে ফিরে যেতে চাই, আর আপনাকেও দাদামশাই-এর বিষয় আশয় সব দেখতে হবে।'

'সে কি লক্ষ্মী—'

'আবার আমায় 'লক্ষ্মী' বললেন যে—'

'ওঃ! ভুলে গেছি, দিদিমণি! স্বামীর উপর কি অভিমান করতে আছে ভাই? আমার সময় হলেই আমি আসবো, আমায় ডেকে পাঠাতে হবে না।'

সুধা সসম্ভ্রমে হিরণ্ময়কে প্রণাম করিল। সে চলিয়া গেল।

পরদিন লালা ফিরিয়া আসিলে চতুর নায়েব নরহরি কহিল, 'আপনাকে একটা কথা বলবো-বলবো মনে করছি—'

'কি বলবেন?'

'হিরুবাবুকে আপনি বরখাস্ত করেছেন, তবুও তিনি এমন করে অন্দরমহলে এসে মাঠাকরুণের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে যান—'

'সে কবে এসেছিল? আপনি দেখেছেন?'

'কাল সন্ধ্যাবেলা অধরের সঙ্গে এসেছিলেন। এটা বোধ হয় ভাল দেখায়না। তবে আমার কোনো অপরাধ নেবেন না।'

অগ্নিতে যেন ঘৃতাহুতি পড়িল। লালাসাহেব শীঘ্র অন্দরে গিয়া ডাকিলেন, 'সুধা, সুধা কোথায় ?'

মলিনমুখী, গর্ভভবে অলসগমনা সুধা লালাসাহেবের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, বিচারকের রূঢ় কটাক্ষের কাছে আসামীর মত। 'কাল তিরু বাড়ীর ভিতর এসেছিল কেন ?'

'আমি ডেকে পাঠিয়েছিলুম।'

'তোমায় না একবার বারণ করেছি তার সঙ্গে কথা কইতে ? সে কি তোমার এত আপনার লোক হয়ে গেল ? কেন তাকে ডেকেছিলে আমি জানতে চাই।'

'না, আমি সে কথা বলবোনা। তার জন্যে যা শাস্তি আমার পাওনা হয়, দাও।'

'তুমি আমার বাড়ী হতে দূর হয়ে যাও।'

এত বড় প্রত্যাখ্যানের ও অপমানের কথা স্বামীর মুখে সে শুনিবে কখনো আশা করে নাই। এই বজ্রকঠোর বাক্যে সে যেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, ক্রমে বাস্তবিকই সে অচেতন হইয়া কক্ষতলে পড়িয়া গেল। চারিদিকে একটা খুব গোলমাল পড়িয়া গেল।

সেদিন অপরাহ্নে অধরকে ডাকিয়া সুধা কহিল, 'দাদু, আমায় ও-বাড়ীতে রেখে আসবে চল। পাল্কী খবর দাও। এ বাড়ীতে আর আমার অন্ন নেই।' অধর সব বুঝিত,

সব জানিত, সে নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে পাল্কী ডাকিতে গেল। সুধার মুখে তখন স্থির প্রতিজ্ঞার একটা রুদ্র আঁভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে।

২৭

গ্রামে একটা গভীর আন্দোলন চলিয়াছে। সাধারণেরা কোন একটা বিষয়ে যে সমালোচনা করে, তাহার দুইটা দিক আছে। একটা তাদের নিজের যথেচ্ছ সমালোচনার দিক, আর একটা সত্যের দিক। অনেক সময়ে তাহাদের বিরুদ্ধ সমালোচনার বিপুল আন্দোলনে সত্যের জ্যোতি ম্লান হইয়া যায়, কিন্তু কালক্রমে যাহা যথার্থ সত্য, তাহা অপ্রত্যাশিতভাবেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। লালা ও শিউলি ঘটিত সমস্ত কাহিনীটা যখন সকলেই জানিতে পারিল তখন লালার সম্বন্ধে কোনো বিরুদ্ধ মত প্রচার না করিয়া সাধারণে শিউলির সর্ব্বনাশী চরিত্রের কথা কহিতে লাগিল। তবে পূত ও নিষ্কলঙ্কচরিত্র পিতার সন্তান হইয়া লালা যে এত বড় একটা ঘৃণ্য কাজ করিতে পারে, তাহা প্রথমে লোকে বিশ্বাসই করিতে পারিল না। কিন্তু শেষে তাহারা জানিল যে জমীদারের বাগানবাড়ীর অধিশ্বরী শিউলি আজ অশেষ

ধনরত্নের অধিকারিণী হইয়া নিজের তর্জ্জনী চালনায় সমস্ত জমীদারীটা শাসন করিতেছে। ইহার ফল হইল এই যে আবার সমস্ত প্রজা জমীদারের এই চরিত্র-দৌর্ব্বল্য দেখিয়া বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইল।

নীলু ঘোষের আবাদের কাজ খুব দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। কাজটা যে সাধারণের উন্নতিকল্পেই আরব্ধ হইয়াছে, তাহা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব যখন বুঝিলেন, তখন তিনি স্বেচ্ছায় এককালীন পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা দিলেন। জেলার অন্যান্য ধনীসম্প্রদায়েরাও হিরণ্ময়ের এই সৎকার্য্যে অজস্র অর্থ দিলেন। সেখানে স্কুল ও হাঁসপাতাল খোলা হইল হিরু নিজেই তাঁতের কাজে লাগিয়া গেল। নবগোপালের মৃত্যুর পর ঊষা স্বেচ্ছায় আসিয়া এই কাজে যোগদান করিল। তখনো তার চক্ষের জল শুকায় নাই, হৃদয়ের ক্ষত সারে নাই। হিরণ্ময় এই সঙ্ঘের নাম দিল 'মাতৃসঙ্ঘ'।

সুধার এই নির্য্যাতনের সংবাদ পাইয়া যদুনাথ ও জীবন-কুমারী কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। যদুনাথ স্বয়ং এখন আর জমীদারীর কাজ দেখিতে পারেন না বলিয়া আবার হিরুকে ডাকাইয়া তাহারই হাতে সমস্ত কাজ অর্পণ করিয়াছেন। লালাসাহেবের কীর্ত্তিকলাপ যখন তাঁহার

কাণে আসিল, তখন তিনি কোনই কথা কহিলেন না। পারিবারিক দুঃখ ও অশান্তি ভোগ করিয়া করিয়া তিনি একেবারে যেন পাষাণ হইয়া গিয়াছিলেন ; কিন্তু এই প্রিয়-তমা দৌহিত্রী যখন অশ্রুসজল চক্ষে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিল, তখন তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন ; বলিলেন, 'কোন্ পাপে আমার এই শাস্তি হল রে, লক্ষ্মী বোন্ আমার ?'

কয়েক দিবস পরে সুধা একটী সুন্দর পুত্রসন্তান প্রসব করিল। তাহার একমাথা কালো কোঁকড়ানো চুল, টানা টানা কৃষ্ণতার দুটী চোখ—কি স্বাস্থ্যময়, সুন্দর চেহারা ! পিতার অনুরূপ দেহসৌষ্ঠব, মাতার অনুরূপ কমনীয়তা,—এই সুন্দর শিশুটী যেন দেবতার সমস্ত কল্যাণ শিরে বহন করিয়া এই নিরানন্দ গৃহে শান্তির উজ্জ্বল কিরণ বিতরণ করিতে আসিল। প্রসূতি এই নবজাত শিশুটীকে সজল-চোখে চুম্বন করিয়া আদরে বক্ষোনীড়ে রাখিয়া অশেষ তৃপ্তি অনুভব করিল। মোক্ষদাসুন্দরী একদিন আসিয়া মাতা-পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন। জীবনকুমারী মোক্ষদাকে কহিলেন, 'আজ এসেছ দিদি ? আহা, যদি একবার এসে দাঁড়াতে দু'বছর আগে তাহলে আর ছোটতরফে বিয়ে হতনা ! জানো ত, দিদি, সব—তোমার হিক্ক হতেই আজ আমার জমীদারী দাঁড়িয়ে আছে, নইলে আজ আমরা

কোথায় এসে দাঁড়াতুম বল দেখি! ঐ ওর পেটে ঐটুকু হয়েছে—দুঃখের দিনে ও কেন এল বল দেখি?'

মোক্ষদা বলিলেন, 'ষাট্, ষাট্, ও কথা বলবেন না, দিদি! আবার সব ঠিক হয়ে যাবে, সুধা লক্ষ্মী মেয়ে, ওর কপালে দুঃখ থাক্‌তে পারে না,—ভগবান আপনাদের সহায়—আপনাদের ভয় কি?'

এই উক্তিতে জীবনকুমারী সমধিক প্রীত হইয়া বলিলেন, 'তোমার পায়ের ধূলো দিয়ে যাও, দিদি। জামাই ত এই রকম! কে সে কথা বলবে, দিদি?'

বাড়ীর ভিতরে যখন এই সব কথা হইতেছিল, বাহিরে হিরণ্ময় ও যদুনাথের কি একটা বিষয়ে গোপন পরামর্শ চলিতেছিল। হিরণ্ময়ের উজ্জ্বল শিবসন্নিভ মূর্ত্তি আজ আরও উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। তাহার আয়ত চক্ষু দুটী প্রীতিস্নিগ্ধ, জগতের সমবেদনায় করুণ, অথচ বড় প্রশান্ত,—নির্বাত দীঘির শান্ত জলে যেন চোখদুটী সর্ব্বদাই ভরিয়া আছে। তাহার অঙ্গে একখানি শুভ্র উত্তরীয় ছাড়া আর কোনো আবরণ নাই. রক্তপদ্মদলের মত নগ্নচরণদুটী, এমন বিনয়ী অথচ তেজস্বী, স্বল্পভাষী অথচ কর্ম্মকুশল যুবকের সাহচর্য্যে আসিয়াও লালাসাহেব কোন্ পাপে অধঃপতিত হইল, তাহা যদুনাথ সহজে বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার এখনো

মনে হইতেছিল—বুঝি সমস্ত ব্যাপারটাই একটা স্বপ্নময় কাহিনীমাত্র। কিন্তু যখন সমস্ত প্রমাণ হাতে হাতে মিলিয়া গেল, তখন তিনি নিজের ব্যবসায়বুদ্ধির স্বল্পতার জন্য নিজেকেই ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

যদুনাথ কহিলেন 'বাবা, আমি দেখছি ঐ নীলু ঘোষের আবাদটা নিয়েই তোমার সঙ্গে লালার একটা গোল বাধবার সম্ভাবনা। পাশেই ছোটতরফের প্রকাণ্ড চষত জমি, তোমার পায়ে পা বাধিয়ে লালা এখন ঝগড়া করবে। তোমার জন্যেই যে আমার জমীদারীটা সে গ্রাস করতে পারেনি—এ কথা সে মর্ম্মে মর্ম্মে জেনেছে বলেই আক্রোশের মাত্রাটা তোমার উপরেই গিয়ে পড়েছে। কিন্তু খুব সাবধান থেকো। কি জানি কখন বিপদ হয়।'

না, রাজাবাবু আমি কখনো গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে যাবো না। আমাদের কাজ যে সেখানে অনেকদূর এগিয়ে গেছে, এখন সে যায়গাটা ছেড়ে এসে আপনার জমীদারীতে উঠে আসা অসম্ভব। আহা!—সে সব গরীব দুঃখীদের দেখলে আপনার চোখ ফেটে জল বেরুবে। কোমরে একখণ্ড কাপড় নেই, দুবেলা দুমুটো ক্ষুধার অন্ন নেই,—এই দারুণ দুর্দ্দশার তাড়নায় অনেকে উঞ্ছবৃত্তি করে, কেউ বা চুরি ডাকাতি করে, কেউ চরিত্রের গৌরব হারিয়েছে।

আজ তারা সব সেখানে কেমন প্রাণ দিয়ে খাটছে,— একদিন দেখে আসবেন। ‘আচ্ছা, একদিন যাবো। এখন লক্ষ্মীর সম্বন্ধে কি করি, বল দেখি ? সে আমায় মুখ ফুটে কিছু বলে না বটে, কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারি— তার বুকে দিনরাত কিসের আগুন জ্বলছে। লালাসাহেব দুহাতে এখন পয়সাগুলো ওড়াচ্চে। গান, বাজনা, ইয়ার আর এই নতুন রোগে সে একেবারে পশুর অধম হয়ে পড়েছে। আর তার কখনো মুখদর্শন করতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু যখন লক্ষ্মীর মুখের দিকে চেয়ে দেখি—’

যদুনাথের বাড়ীর দেউড়ীর পাশে যে প্রকাণ্ড কৃষ্ণচূড়া গাছটী রাঙাফুলে আকাশটাকে পর্য্যন্ত আরক্ত করিয়া দিত, হিরু সেই গাছের পানে অন্যমনস্কভাবে চাহিয়া রহিল। সেই দৃঢ় কর্ম্মঠ শরীরে এমনি একটা শান্ত কমনীয়তা ছিল যে একবার তাহাকে দেখিলে আর ভোলা যাইত না। সে যেন কর্ম্মেরই প্রতিমূর্ত্তি। যদুনাথের শেষ উক্তিটী শুনিয়া তাহার মনের মধ্যে বোধ হয় একটা করুণ সুর বাজিয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি চাদরের প্রান্তে মুখ লুকাইয়া কহিল, ‘আজ আসি, রাজাবাবু।’

‘এসো, বাবা’, বলিয়া যদুনাথও সেই পবনশিহরিত, রাঙা-ফুলে-ভরা গাছটার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

নরহরি বড় চতুর কর্ম্মচারী। কেমন করিয়া প্রভুর মন যোগাইয়া কর্ম্ম করিতে হয়, কোন কলটী টিপিলে কোথায় গিয়া আঘাত লাগে—এ সব সন্ধান তাহার বেশ ভাল রকমই জানা ছিল। সে বেশ বুঝিয়াছিল যে হিরণ্ময়ের জন্যই তাহার চাকরী গিয়াছিল; তাহার জন্যই সে প্রভুর বিরাগভাজন হইয়াছিল। আবার সংপ্রতি সে "মাতৃসঙ্ঘে"র কাজে যেরূপ যশোলাভ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ হয়—সে-ই বোধ হয় আবার ম্যানেজারীর মোলায়েম মসনদে বসিবে। সুতরাং এই পথের কণ্টককে একেবারে দূর করিতে না পারিলে তাহার আর কোন মঙ্গল নাই।

হিরণ্ময়ের সঙ্গে শত্রুতা করিবার একটা চূড়ান্ত সুযোগ মিলিল। আবাদের জমির পাশেই লালাসাহেবের জমি। নরহরি বলিল আবাদের যে সীমানায় কর্ম্মিগণের বাসস্থান নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা লালাসাহেবেরই জমি। লালাকে একথা বলিতে সে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া কহিল, 'ঘরগুলোয় সব আগুন ধরিয়ে দিন! যেথানেই যাই, সেখানেই হিরুর কথা! কেন, সে কি দেবতা? তার নাম আমার কাছে করবেন না। আজই পাইকেরা গিয়ে সব ঘরগুলো ভূমিসাৎ করে দিয়ে আসুক! কাল আমায় যেন খবর

দেওয়া হয়।' নবনির্ম্মিত গৃহসমুদয় নষ্ট করিতে হইলে যে লোক-বল আজ আবশ্যক তাহা তাহার সবই ছিল। কিন্তু গোল হইল—হিরণ্ময়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাবনায়। 'মাতৃসঙ্ঘের' কাজে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইতে সামান্য প্রজা পর্য্যন্ত সকলেই অবস্থানুরূপ সাহায্য করিয়াছিল,—সেখানে বলপ্রয়োগ করিতে হইলে—একটু অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়াই করিতে হইবে।

গোঁসাইপুরের বাড়ীতে বসিয়া নরহরি এই সব কূট চিন্তা করিতেছে এমন সময় তাহার প্রেরিত একটী কৃষক 'মাতৃসঙ্ঘের' সমস্ত সংবাদ লইয়া আসিল।

'কে, ছিদেম না কি!'

'হেঁ বাবু মশায়।'

'কি খবর আনলি রে?'

'সে যে পেরকাণ্ড শহর, বাবুমশয়, তার মধ্যি ঢুক্‌বো কেম্‌নে?'

'সে কি রে, তুই বাসুদেবপুরের আবাদে তাহলে যাস্‌নি?'

'হেঁ বাবুমশয়, মুই তার মধ্যি গিয়ে দেখি সব বড় বড় হাতীর মত যন্তরপাতি ধোঁয়া ছাড়্‌তেছে আর গজরাচ্চে। দলে দলে সব যোয়ানমদ্দ, ছাওয়াল আর সব বেবিশ্চে। হিরুবাবু চর্‌কির মত ঘুর্ ঘুর্ করি বেড়াচ্চে। কোত্থিকে

যাবো, বাবুমশয় ? হাঁটিতে হাঁটিতে মোর পা খানি গেল, সে কি ফুরোয়, বাবুমশয় ?'

'তোর লাঠিয়াল সব ঠিক আছে ত ?'

'তা আছে, বাবুমশয়, কিন্তু—'

বলিতে বলিতে ছিদাম তেওর মাথা চুলকাইতে লাগিল। তার গায়ে অসুরের ক্ষমতা ; সে একবার জমীদারের একটা দুর্দান্ত ক্ষ্যাপা হাতীকে একলা বশীভূত করিয়াছিল বলিয়া সকলে তাহাকে 'হাতীমামা' বলিয়া ডাকে। সে একলা একটা পাঁটা খাইতে পারিত।

নরহরি চুপি চুপি কহিল, 'কাল রাত্রে না ভোরে ?'

'এজ্ঞে, এড্ডু আব্ছা আব্ছা থাকতে গেলেই সুবিধে হয়।'

'তাই ভাল। কজন লোক যাবে তোর সঙ্গে ?'

'এজ্ঞে, বাটজন পাকা লেটেল আছে।'

'তোরা সেখানে গিয়ে কি করবি, বল্ দেখি ?'

'মোরা সব কজনে মিলে সেই ঘরগুলো জ্বালিয়ে দেবো। আর হিরুবাবুকে বেঁধে আনবো, বাবুমশয়।'

'না রে, বেট বোকা হাতী, জ্বালাতে হবে না। সব কথানা ঘর ভেঙ্গে দিয়ে আসবি, আর যদি কেউ বাধা দেয় ত তাকে ধরে নিয়ে আসবি। মারামারিতে কাজ নেই, বুঝিল হাঁদারাম ?'

'বাবুমশয়, এত্তা ত সোজা কথা! তবে মোদের—'

আবার হাতীমামা মাথা চুলকাইতে লাগিল।

'আরে তোদের বকশিশ ত হবেই? আমি জমীদারবাবুকে বলবো তোদের এক বছরের খাজনা রেহাই হবে, ছজোড়া করে কাপড় আর দশ দশ টাকা পাবি। যা, মনে থাকে যেন কাল ভোরে।'

'হেঁ বাবুমশয়।' এই বলিয়া সে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। নরহরি আবার গভীর চিন্তায় মগ্ন হইল।

বিকালে ভিতর বাড়ীতে লালা ও শিউলি গল্প করিতেছে। শিউলি একখানা মূল্যবান মান্দ্রাজী শাড়ী পরিয়া আছে, তাহার অঙ্গে বহুমূল্য অলঙ্কার, গায়ে একটা সবুজ সিল্কের সূক্ষ্ম সেমিজ। সেই সদাহাস্যময় মুখের ও আবেশময় চোখের এমনি একটা আকর্ষণ ছিল যে লালাসাহেব তাহাকে একদণ্ড দূরে রাখিতে পারিত না। ঠিক বধূর মত শিউলি লালাসাহেবকে ভালবাসিত কিনা বলা যায় না, কারণ লালাসাহেবের অতুল ধনরত্ন, দাসদাসী, বসনভূষণ ইত্যাদি কিছুতেই তাহার বিশেষ আকর্ষণ দেখা যাইত না। সব কাজেই তাহার একটা উচ্চ মর্য্যাদা, উদারতা ও মুক্তহস্ততা দেখা যাইত। একদিন দাসী আসিয়া কহিল, 'মা, আমার ছেলেটী আজ চারদিন জরে অঘোরে পড়ে আছে,

ঘরে একটা পয়সা নেই।' শিউলি অমনি হাতের বালা খুলিয়া দিয়া কহিল, 'যা, মা, পোদ্দারের দোকানে এটা বেচে কিছু নিগে যা।' পরের অর্থে এই উদারতা দেখাইতে তাহার নিজের কিছু খরচ হইত না বটে, কিন্তু ইহাতে বেশ বোঝা যাইত যে সে অর্থের জন্য লালাসাহেবের গৃহে আসে নাই। কিন্তু সে জাঁকজমক বড় ভালবাসিত। লালা অনেক খরচ করিয়া বাড়ীতে 'ডাইনা-মো' বসাইয়া বৈদ্যুতিক আলো ও পাখা আনিয়াছিল ; কাশ্মীরের কারপেট, মার্ব্বেল পাথরের মূর্ত্তি, কৃত্রিম উৎস, মূল্যবান বিলাতী ফুলের গাছ প্রভৃতি আসবাবপত্র ও সৌন্দর্য্যের ভিতরে শিউলি রাজরাণী হইয়া বসিয়া থাকিতে চাহিত। লালাসাহেব তাহার রূপের প্রশংসা করিয়া দিবানিশি বলিবে—'কি সুন্দর! কি সুন্দর!'—ইহাই তাহার ভাল লাগিত। মায়াবিনীকে কি পূজায় তুষ্ট করিতে পারা যায়!

'সুধার নাকি একটী খুব সুন্দর ছেলে হয়েছে? শুনেছ গা? তার দাদামশাই দিদিমা কাশী থেকে যে এলো, একবার তারা তোমার খবর নিলে না? সুধাকে বড় দেখতে ইচ্ছা করে, না?'

'না, শিউলি, তোমায় ছেড়ে আমার আর কোথাও যেতে ইচ্ছে নেই। সুধার সঙ্গে বিয়ে—সে একটা স্বপ্ন,

সে সব আমি ভুলে গেছি। আমি কিন্তু এবার হিরুকে একটা শিক্ষা দিতে চাই।'

'হিরুদাকে কি শিক্ষা দেবে তুমি? বিদ্যায়, রূপে, গুণে, ব্যবহারে—হিরুদার সমকক্ষ আর কে আছে? পাড়ার সব লোকগুলো তার গোলাম হয়ে আছে।'

'তোমার মুখেও ঐ কথা? আমার জমীদারের নায়েবী না করলে কে তাকে চিনত? পাজী, নচ্ছার—'

'না না, ওকথা বলোনা। হিরুদার গালাগাল আমি সইতে পারবনা। কে আমায় বাঁচিয়েছিল? কে আমায় বোনের মত স্নেহে আদরে যত্নে রক্ষা করেছিল? যার ঘরের দুয়ার আমার জন্য সর্ব্বদাই খোলা রয়েছে তার এমন অপমান আমি সইতে পারবো না।'

সহসা শিউলির পর-প্রশংসাপূর্ণ এই উচ্ছ্বসিত বক্তৃতার জন্য লালাসাহেব মোটেই প্রস্তুত ছিলনা। আজকাল কাহারো মুখে সে হিরণ্ময়ের কোনো প্রশংসা সহিতে পারিত না। শিউলির মুখে হিরণ্ময়ের অজস্র স্তুতিবাদ শুনিয়া লালাসাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, 'ওঃ, সে যে তোমার ভারি পেয়ারের লোক দেখছি!'

শিউলির সুন্দর অর্দ্ধচন্দ্রসন্নিভ কপালে একটী শিরা স্ফীত হইয়া উঠিল। সে কহিল, 'নরহরিবাবু হাতীমামার

সঙ্গে যা গুপ্ত পরামর্শ করেছেন, তা আমি সব শুনেছি। একজন নিরীহ ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে এই সব ষড়যন্ত্র কি ভালো হচ্ছে তোমার ?'

'তোমার কাছে আমার শিখতে হবে না কি ?' এই বলিয়া লালাসাহেব সেখান হইতে চলিয়া গেল। সেই অতুল বৈভব, ধনরত্ন, জাঁকজমক শিউলির বিষের মত মনে হইতে লাগিল।

২৯

সেইদিন সন্ধ্যার প্রথম যাম অতীত হইলে শিউলি পাল্কী করিয়া নীলু ঘোষের আবাসে উপস্থিত হইল। সেখানে একটী চাষা অন্ধকারে বসিয়া গেটের কাছে তামাক খাইতেছে দেখিয়া তাহাকে সে জিজ্ঞাসা করিল, 'হাঁ গা, বাছা, হিরুবাবু কোথায় থাকেন, একবার তাঁকে ডেকে দিতে পার ?'

চাষা এই সুসজ্জিত অসামান্য রূপসীকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া কহিল, 'ঐ যে সাদা ঘর, ঐখানে গেলেই দেখা পাবে।'

ত্রস্তচরণে শিউলি সেই ঘরের দ্বারের নিকট মুখ বাড়াইয়া দেখিল বাতির আলোকে শয্যার উপর উপুড় হইয়া হিরণ্ময় কি লিখিতেছে। বাতির ম্লান আলোকে তাহার

সেই চিরপরিচিত শান্ত মুখখানি অপার্থিব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত দেখাইতেছিল। গুচ্ছে গুচ্ছে কুঞ্চিত কেশদাম কপালে আনত হইয়া রহিয়াছে। তাহার মুখে একটুও বিষাদের বিরাগের বা অশান্তির কুটিল ছায়া পড়ে নাই। এক মিনিট—দুই মিনিট—তিন মিনিট—শিউলি যে সেই গুপ্তস্থানে হইতে হিরণ্ময়ের দেবপ্রতিম মুখখানির দিকে কতক্ষণ চাহিয়া ছিল তাহা সে নিজেই জানেনা। যখন জানিল, তখন ডাকিল, 'হিরুদা!'

বজ্রাহতের মত ধড়মড় করিয়া উঠিয়া হিরু কহিল, 'কে ও?' চাহিয়া দেখিল—কালো সিল্কের উপর সলমা-চুমকীর কাজ-করা পোষাকে ও বহুমূল্যে অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া একটী রূপসী নারী নিতান্ত পরিচিতার মতই তাঁহাকে ডাকিতেছে। রাত্রির নির্জ্জনতায় অভিসারিণী বেশে এ কে তাহার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে? এ কি—এ যে শিউলি!

'তুমি এখানে কেন, দিদি? এই রাত্রে? গোঁসাই-পুর থেকে এলে? কার সঙ্গে এলে?' বলিয়া হিরণ্ময় উঠিয়া দাঁড়াইল।

'হিরুদা, তোমার বিরুদ্ধে লালাসাহেব ষড়যন্ত্র করছে, কাল ভোরে তার ষাটজন লাঠিয়াল এসে তোমার আবাদের নূতন ঘরগুলি ভেঙ্গে দিয়ে যাবে। মারামারি হবারও

সম্ভাবনা আছে। তোমাকে সময় থাকতে সাবধান করবার জন্য আমি গোঁসাইপুর থেকে ছুটে এসেছি।'

'মিছামিছি কেন এত কষ্ট করলে, দিদি? এখন আবার কার সঙ্গে তোমায় পাঠাই?'

হিরণ্ময় একটু উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। শিউলিও যেন আরও কিছু বলিবে-বলিবে করিতেছিল। তুষারে অলক্তক-রাগ লাগিলে যেমন সুন্দর দেখায়, তেমনি তার শোণিম কপোলে স্বেদবিন্দু ফুটিয়া উঠিল। এক হাতের জড়োয়া-বিজড়িত ব্রেস্‌লেটখানি অন্য হাতে নাড়িতে নাড়িতে সে কি-একটা কথা বলিবার চেষ্টা করিল। তাহার চারু-পিনদ্ধ বক্ষতটে যেন কিসের একটা উত্তাল তরঙ্গ আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল।

হিরু কহিল, 'আমায় আর কিছু বলবে, দিদি?'

'আর—আর—আঁ—না—আর কিছু না'—বলিয়া তাড়াতাড়ি হিরণ্ময়কে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া সে অন্ধকারে মিশিয়া গেল। হিরু কথা কহিতে পারিল না, কারণ যে কথাটা এই কঠোর রহস্যের ভিতর গুপ্ত ছিল তাহা তাহার কাছে প্রভাতে সূর্য্যকিরণের মতই পরিষ্কার হইয়া গেল। কিন্তু সে একটুও বিচলিত হইল না।

গোঁসাইপুরের বাড়ীর খিড়কীতে যখন শিউলি পাল্কী

হইতে নামিল তখন রাত এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে। বাহিরের প্রকাণ্ড বৈঠকখানায় সেদিন বন্ধুগণের জন্য লালাসাহেব একটা আনন্দ-ভোজ দিতেছে। যে শিউলিকে সে চোখের আড়াল করিতে পারিতনা, হিরণ্ময়ের প্রশংসা করিবার জন্য আজ সে সন্ধ্যা হইতে তাহাকে একটীবারও খোঁজে নাই। কিন্তু শিউলি চোরের মত নীরব চরণে যখন উপরের ঘরের প্রকাণ্ড দর্পণের কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া নিজের সেই রতিলাঞ্ছন মূর্ত্তি দেখিতেছে, তখন বেহারা গোবিন্দ সিং আসিয়া কহিল, 'মায়ি, আপনাকে একবার বাহিরে যাইতে হোবে।' শিউলি ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, 'যা, যা, বাবুকে বল্‌গে যা, এখন আমার সময় নেই।' আবার কি ভাবিয়া কহিল, এই গোবিন্দ সিং, যা, আমি যাচ্ছি।'

দর্পণের বুকে যে রূপ প্রতিফলিত হইয়াছিল, তাহা দেবদুর্লভ, স্বর্গের উর্ব্বশীরও কি এই রূপ আছে? এই অপ্সরঃসম্ভব রূপের পানেও হিরণ্ময় একবার ফিরিয়া চাহিল না? তবে এ রূপ ছার—এ রূপের কোনই মূল্য নাই!...

বৈঠকখানা আজ আলোকে পুলকে আবেশে গন্ধে ইন্দ্রের নন্দনকাননের শোভা ধারণ করিয়াছে। সেখানে আজ একজন বড় গায়ক আসিয়াছে। লালাসাহেব চিরদিনই

সঙ্গীতপ্রিয়, তাই সে দেশবিদেশ হইতে বিখ্যাত গুণী ও ওস্তাদ্‌দের মাঝে মাঝে বহু অর্থব্যয় করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আনিত। সভায় অনেক বন্ধুবান্ধবও আসিয়াছে। লালা-সাহেব একটী সূক্ষ্ম সাদা সিল্কের পাঞ্জাবী পরিয়া পিয়ানোর কাছে বসিয়াছে। নবীন আগন্তুক গায়কটী বাঁয়া-তবলায় বোল্ ফুটাইতেছে। শিউলি ধীরে ধীরে আসিয়া লালা-সাহেবের পাশে একটী চেয়ারে গিয়া বসিল। সেখানে সুরার লহরী উঠিত, আমোদ বিলাসের স্রোত ছুটিত, কিন্তু কেহ কখনো শিউলির সঙ্গে রং-তামাসা করিতে সাহস করিত না। চিরকাল আত্মগর্ব্বে উন্নতশির শিউলিও কখনো কাহারো সঙ্গে কথা কহিতনা।

আজ নূতন গায়কটী বহু কসরত করিয়া গাহিতেছে—

—'নজরা দিল বাহার (বেনিয়া লেলে রে)
কুল পিলায়ে চল্ জাতি সব সখিয়া চল্ জাতি।
রোয়ে মিয়া যায়েক রহাবয়ে—
মস্তা বুকবুল তোরি তম জানাবে আজানি সে মিয়া জানাবে'

পর্দ্দায় পর্দ্দায় তার কোকিল-কণ্ঠ উঠিতেছে ও নামিতেছে। মল্লযুদ্ধের সময় এক একটা কৌশলময় প্যাঁচ যেমন দর্শকের বিস্ময় উৎপন্ন করে, এই গায়কটীর সুরও তেমনি সমবেত শ্রোতৃবর্গের চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত করিতেছিল। সকলে আনন্দ-

সূচক চীৎকার করিয়া উঠিল—'কেয়াবাৎ! কেয়াবাৎ!' লালা বলিল, 'বাঃ চমৎকার! রাইচরণবাবু!'

রাইচরণ?—কোন্ রাইচরণ? শিউলি এতক্ষণ মুখ তুলিয়া চাহিতে পারে নাই, এখন গায়কের মুখের দিকে ফিরিয়া চাহিল। গায়কটী এতক্ষণ তাহারই পানে চাহিয়া প্রাণের সমস্ত উচ্ছ্বাস যেন তাহারি চরণে নিবেদন করিতেছিল। গায়ক আবার পূরবীতে অতি সূক্ষ্ম কোমল-গান্ধার দিয়া গাহিল—

'আও রে মরি শ্যাম নগরিয়া
ক্যায়সে যাঁছ মঁয় ঘাট—ভরেছঁ গাগরিয়া'—

গান সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে লালাসাহেব কহিল, 'শিউলি, রাইচরণবাবুকে তোমার একটা গান শুনিয়ে দাও।'

রাইচরণবাবু কহিলেন, 'শিউলি? শিউলি? শিউলি কার নাম, বাবুসাহেব?'

লালা কহিল, 'এই যে আমার স্ত্রী—এরই নাম শিউলি।'

রাইচরণবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সে হাসিতে এমন একটা বিষ মিশানো ছিল যে সমস্ত আনন্দ-উৎসব যেন তিক্ত হইয়া উঠিল।

'আপনার স্ত্রী, বাবুসাহেব? ওঃ, আগে বুঝতে পারিনি।'

শিউলির আর কথা ফুটিতেছিলনা, সে মনে মনে একেবারে নয় দশ বছর পিছনে হটিয়া গিয়াছিল—সে যখন বিষ্ণু-কান্তারের পুত্রবধূ ছিল, যখন তাহার স্বামী ছিল, যখন তাহার শ্বশুরের এই লালাসাহেবের মতই ধন-গৌরব, ব্যবসায়ে প্রতিপত্তি ও রত্নবৈভব সবই ছিল। সে আর কৌতূহল

দমন করিতে পারিতেছিলনা, অনেকক্ষণ পরে মনে মনে সাহস সঞ্চয় করিয়া শিউলি কহিল,'আপনার বাড়ী কোথায় ?'

রাইচরণবাবু আবার হাসিলেন, রুমালে মুখখানি মুছিয়া কহিলেন—'আমার বাড়ী সর্ব্বত্রই ! যেখানেই থাকি, সেখানেই আমার বাড়ী !'

'আপনি বিয়ে করেন নি ?'

রাইচরণবাবু এবার কিছু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, 'বিয়ে —বিয়ে ? হাঁ, বোধ হয় অনেকদিন পূর্ব্বে যেন করেছিলুম একবার, কিন্তু তার সঙ্গে আবার আর একজনের বিয়ে হয়ে গেছে ! এমন কাণ্ড কথনো শুনেছেন, বাবুসাহেব ?'

শিউলির মুখমণ্ডল তখন মুমূর্ষুর মুখের মত পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছে, সে আঙুলে আঁচল জড়াইতেছিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাপ্লুত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার যেন একটা প্রবল শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইল। হঠাৎ এই মজলিসের মাঝখানে এমনি একটা নিশীথ-নীরবতা কঠোর প্রস্তর-খণ্ডের মত চাপিয়া বসিল যে লালাসাহেব আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলনা। একটা কিছু গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে ভাবিয়া বন্ধুবর্গের মুখেও বিষাদের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। দুই একজন শরীর ভাল নাই বলিয়া সরিয়া পড়িল। রাইচরণ বাবু বাঁয়াটা কোলের মধ্যে টানিয়া হাসিমুখে কহিলেন, 'বাবু-সাহেব, আপনি কিছু মনে করবেন না, শিউলি আমারই স্ত্রী, আপনার নয়,———মার্জ্জনা করবেন, বাবুসাহেব !'

তাহার এই কথায় লালাসাহেব যেন একেবারে আকাশ হইতে পড়িল। সে বন্ধুবর্গকে সরাইয়া দিয়া শিউলির দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'এ কি কথা, শিউলি? রাইচরণবাবু তোমার স্বামী?'

শিউলি মুখ নীচু করিয়া রহিল।

'তুমি ওঁর সঙ্গে যাবে?'

শিউলির উত্তর নাই।

রাইচরণবাবু বেশ নির্ব্বিকারভাবে কহিলেন, 'আচ্ছা বাবুসাহেব, তাড়াতাড়ি নেই। একদিন আমি থেকেও যেতে পারি।' বলিয়া স্বচ্ছন্দে তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

শিউলির মোহ কাটিয়া গিয়াছে। এতদিনের তাসের ঘর এক ফুৎকারে পড়িয়া গেল। এ যে তাহার সেই নিরুদ্দিষ্ট স্বামী, তাহা জানিতে তার একটুও ভুল হইল না। আজ তাহার মনের উপর দিয়া অনেক ঝড় বহিয়া গেল, সে যে কি করিবে কিছুই কূলকিনারা দেখিতে পাইল না। মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল সেই সুসজ্জিত বৈঠকখানার সব আলোক কয়টা কে নিবাইয়া দিয়া গিয়াছে, বাহিরে ঝাউ গাছের সারে সারে বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ বিরহের তপ্ত নিঃশ্বাসের মত বহিতেছে, ঝাউ গাছের ফাঁকে কৃষ্ণা পঞ্চমীর ক্ষীণ জ্যোৎস্নাটুকু পাগলের হাসির মত শূন্যভাবে মর্ম্মর-কক্ষতলে আসিয়া পড়িয়াছে। শিউলি ডাকিল,—'গোবিন্দ সিং, বাবু কোথারে?' সিদ্ধির নেশায় বিভোর হইয়া গোবিন্দ

সিং বাহিরে আসিয়া ঝিমাইতেছিল। সে বলিল, 'বাবু তো নয়ানপুরের কোঠীমে চলা গেছে, মায়ি।'

শিউলি তাড়াতাড়ি সেখান হইতে সরিয়া গেল।

৩০

শিউলি হিরুর কক্ষ হইতে চলিয়া আসিবার পর আবার সে লিখিতে লাগিল। লিখিতে লিখিতে সে শয্যার উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমে সে বড়ই অবসন্ন বোধ করিতেছিল। তাহার ঘুম যখন ভাঙ্গিল, তখন চারিদিকে একটা ভীষণ হুঙ্কারের শব্দ উঠিয়াছে। সে বাহিরে আসিয়া দেখিল যে দূরে নবনির্ম্মিত এক সার খড়ের ঘর ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। তাহার ভিতরে বস্ত্র বয়নের জন্য নানারূপ যন্ত্রপাতি, তুলা ও সূতা ছিল। আকাশের একদিক একেবারে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। বাঁশ বিদীর্ণ হইবার শব্দ হইতেছে, নিদ্রিত জনগণ সকলেই এই আকস্মিক বিপদে বাহিরে আসিয়া 'হায়, হায়' করিতেছে, নারীগণ ও শিশুরা ভয়ে ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতেছে, ভোরের অন্ধকারে অনেক ভীষণদর্শন লাঠিয়াল চারিদিকে মত্তহস্তীর ন্যায় ছুটাছুটি করিতেছে।

হিরু অগ্রসর হইয়া তাহাদের বলিল, 'তোমরা কেন এমন কাজ করলে? নিরীহ লোকেরা তোমাদের কি করেছিল যে তাদের সব পরিশ্রমের ফল তোমরা এক নিমেষে পুড়িয়ে দিলে?'—হিরুর কথা শেষ হইতে না হইতেই পিছন হইতে তাহার অরক্ষিত দেহের উপর

সজোরে লাঠি বর্ষণ হইতে লাগিল। সে আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া অচেতন হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেল।.........

তাহার যখন জ্ঞান হইল, তখন সে দেখিল অপরাহ্নের মলিন কিরণ বাতায়নের ভিতর দিয়া সেই সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে। সে কোথায় আছে বুঝিতে না পারিয়া শিশুর মত ডাকিল, 'মা, মা গো!' পুরোবর্ত্তিনী নতমুখী মোক্ষদা কহিলেন, 'এই যে, বাবা। ঘুমোও একটু বাছা।'

'মা, আমি কোথায়?'

'যদুবাবু কাল রাত্রে তোমায় এখানে এনেছেন। ঘুমোও বাবা একটু!'

'মা, আর কি ঘুম হবে আমার? এইবার একেবারে ঘুমোবো মা! আর তোমায় বিরক্ত করবো না, মা!'

'ছিঃ, ও কথা বলতে নেই, বাছা! চোখ বুজোও দেখি—'এই বলিয়া মোক্ষদাসুন্দরী তাঁহার স্নিগ্ধ মমতা-ভরা করপল্লব হিরুর চক্ষের উপর বুলাইতে লাগিলেন। সাহেব ডাক্তার আসিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই হিরণ্ময়ের জীবনসংশয় হইতে পারে। মোক্ষদা ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে সাহেবের আসিবার প্রায় সময় হইয়াছে।

'মা?'

কি, বাবা আমার?

'সুধাকে একবার ডাকিতে পারো? একটা কথা তাকে বলে যাবো—'

'লালাসাহেব আবার ফিরে এসেছে রে—সে বড় কান্না-কাটি করছে তোর জন্যে—'

'আহা ! বেচারার জন্যে ভারি কষ্ট হচ্ছে মা ! তাঁকেও একবার ডাকো না মা !'

'সব আসবে এখন, বাছা,—তুই একটু ঘুমো দেখি !'

'মা, আর কি আমার সময় আছে ? একবার ডাকো না মা, তাদের দেখি ! মা, আগুনে কেউ পুড়ে যায়নি ত ? সকলে বেশ ভাল আছে ?'

'হাঁ রে, সবাই ভালো আছে, কারো গায়ে একটু আঁচও লাগেনি। তুই বাছা একটুখানি ঘুমোবার চেষ্টা কর্ দেখি !'

'মা. উষাকে দেখো, আহা মেয়েটা কখনো সুখের মুখ দেখেনি। বড় ভালো মেয়ে সে।'

'তোর নিজের ভাবনা তুই ভাব্ না, বাছা ! আমি বাতাস করছি তোকে, আর কথা ক'সনি !'

হিরু তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। ইতিমধ্যে যদুনাথ ও লালাসাহেবের সঙ্গে ডাক্তারসাহেব আসিয়া রোগীকে ভাল করিয়া দেখিয়া গেলেন। রোগীর জীবনী-শক্তি বড়ই ক্ষীণ, তাহার মস্তিষ্কে বিষম আঘাত লাগিয়াছে। কি হয়, বলা যায় না। হিরণ্ময়ের মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, কিন্তু সেই মুখের শান্তসুন্দর কান্তি ও সৌম্য ভাবটী একটুও মলিন হয় নাই। সে যেন সারা দিবসের কঠিন পরিশ্রমের পর গভীর তৃপ্তিসুখে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অনুতপ্ত লালাসাহেব রুমালে অশ্রুপূর্ণ চোখ মুছিতে মুছিতে হিরুর

গাত্রে হাত বুলাইতে লাগিল। যদুনাথ এ দৃশ্য সহিতে না পারিয়া বাষ্পাকুলস্বরে 'ভগবান্ রক্ষা কর'—বলিতে বলিতে বাহিরে গেলেন। মোক্ষদার মুখে প্রশান্ত স্থিরতা, অবিচলিত হৃদয়ে তিনি হিরুর শিয়রে বসিয়া আছেন।

জীবনকুমারীর কাশরোগ বাড়িয়াছে বলিয়া সুধা তাঁহার সেবা করিতেছে। সুধার সঙ্গে লালার এখনো দেখা হয় নাই।

সহসা নিদ্রিত হিরণ্ময় শিহরিয়া উঠিল। তন্দ্রাপূর্ণস্বরে বিকারের ঘোরে বলিয়া উঠিল, 'ভাই সব, কেন এমন কাজ করলে? এরা যে তোমাদের ভাই!' মোক্ষদার বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল, তাঁহার হাতের আইস্ ব্যাগটা খসিয়া পড়িল। তিনি জড়িতকণ্ঠে ডাকিলেন 'হিরু, বাবা!'

রক্তচক্ষু উন্মীলন করিয়া হিরু ঈষৎ অস্পষ্টস্বরে বলিল, 'মা, আমায় ডাকছ?

লালা কহিল, 'এখন কথা কইবেন না, মা।'

হিরু একটু মুখ তুলিয়া লালার দিকে ফিরিয়া কহিল, 'কে, লালাবাবু? মাপ করবেন আমায়। যায়গাটার যতখানি খুসি আপনি নেবেন। 'সঙ্ঘের' লোকদের কিন্তু একটু দেখবেন। বয়নের সঙ্গে—গোঁসাইপুরে—আহা, ভারি দুর্ব্বল—' আরও কি অসংলগ্ন কথা মৃদুস্বরে কহিল, কিছু বোঝা গেল না।

যদুনাথের দেউড়ীতে হাজার হাজার লোক কাতারে কাতারে আসিতেছে। হিরুর আরোগ্যের জন্য সকলেই জোড় করে ভগবানকে ডাকিতেছে। প্রতিমুহূর্ত্তের সংবাদ লইবার জন্য তাহারা বড় ব্যাকুল ও চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। যদুনাথের দুইজন গোমস্তা ও অধর ঘোষ সেই বিক্ষুব্ধ

জনতাকে শান্ত করিতেছে। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ মোটর হাঁকাইয়া আসিয়া খবর লইয়া গেলেন। দত্তপুর, বালুটি, হাঁসখালির জমীদারবাবুরা যদুনাথের বৈঠকখানায় শঙ্কাকুল-চিত্তে বসিয়া আছেন। হিরুর সহপাঠী বন্ধু, কর্ম্মী, তাহার আশ্রিতা নারীগণ সকলেই বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে। বহু অনুরোধেও অধর ঘোষ কাহাকেও নড়াইতে পারিল না।

অপরাহ্নের শেষ আলোক বাহিরের কৃষ্ণচূড়া গাছের রাঙাফুলগুলির সঙ্গে ঝিকিমিকি খেলিয়া গেল। আকাশে একটুও মেঘ নাই, মধুর বাতাসে গত বসন্তের শেষ শিহরণ জাগিতেছে। হিরু ডাকিল 'মা গো!'

'কেন বাবা? কি কষ্ট হচ্ছে তোমার?

'তোমার কোলে শুয়ে আমার আর কোন কষ্ট নেই, মা। মা, আমার একটা কথা শুনবে? মা, আমি যে কাজ শেষ করতে পারলুম না, তা তুমি—'

এবার মোক্ষদা চোখ মুছিলেন। লালাসাহেব কহিল, 'ভাই, হিরু-দা, আমি তোমার কাজ দেখবো। বল, আমায় ক্ষমা করলে?'

হিরণ্ময় লালাসাহেবের হাতখানি সস্নেহে নিজের মুঠার ভিতর লইয়া কহিল, দাদা, তোমার দোষ কি? তুমি আমায় বড় ভালবাসতে। তোমাদের সব ছেড়ে যেতে বড় কষ্ট হচ্ছে—গীতার সেই শ্লোকটা—

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং।
ত্বমব্যয়ং শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥'

হিরণ্ময় বড় অবসন্ন হইয়া পড়িল। মোক্ষদা কহিলেন, 'কি বলবে, বল বাবা ?'

'মা, একবার সুধাকে ডাকবে ?'

লালাসাহেব গিয়া সুধাকে ডাকিয়া আনিল। সুধা সারা সকাল ধরিয়া এখানে বসিয়া ছিল। এখন কক্ষে প্রবেশ করিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল। হিরু একবার প্রাণময় দৃষ্টিতে তাহার পরিম্লান অশ্রুকাতর মুখখানির দিকে চাহিয়া কহিল—

'লক্ষ্মী !'

এই আদরের ডাকে স্নেহশীলা সুধা আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। সে গুণ্ঠনের মধ্যে গভীরস্বরে কাঁদিতে লাগিল। হিরু বলিল, 'লক্ষ্মী বোন, কেঁদো না, লালাবাবুকে ক্ষমা করো, তার উপর অভিমান করো না। স্বামীর উপর কি রাগ করে, দিদি ?'

হিরু দু'একটী কথায় যেন জগতের সব কাজ সারিয়া লইতেছিল। আবার যদুনাথ সাহেবকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। সুধা ও লালা সরিয়া গেল।

হিরুর জ্যোতির্ম্ময় মুখে স্বর্গের আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাহেব নাড়ি দেখিয়া মুখ বিকৃত করিলেন। হিরু খুব অস্পষ্ট-স্বরে কহিল,'মা,মা, ও মা—'বলিয়া গভীর যাতনায় চিরকালের জন্য চক্ষু মুদিত করিল। সকলে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

'সব আমার জন্য রেখে গেলি রে'—বলিয়া মোক্ষদা সাদরে হিরণ্ময়ের গণ্ডস্থলে চুম্বন করিলেন।

সমাপ্ত

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

১। অভাগী (৭ম সংস্করণ)—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর।
২। ধর্ম্মপাল (৩য় সং)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ।
৩। পল্লীসমাজ (৬ষ্ঠ সং)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৪। কাঞ্চনমালা (২য় সং)—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম-এ।
৫। বিবাহ-বিপ্লব (২য় সং)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল।
৬। চিত্রালী (২য় সং)—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি-এ।
৭। দুর্ব্বাদল (২য় সং)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।
৮। শাশ্বত ভিখারী (২য় সং)—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।
৯। বড়বাড়ী (৭ম সংস্করণ)—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর।
১০। অরক্ষণীয়া (৬ষ্ঠ সং)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
১১। ময়ূখ (২য় সং)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ।
১২। সত্য ও মিথ্যা (৩য় সং)—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।
১৩। রূপের বালাই (২য় সং)—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।
১৪। সোণার পদ্ম (২য় সং)—শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৫। লাইকা (২য় সংস্করণ)—শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী।
১৬। আলেয়া (২য় সংস্করণ)—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।
১৭। বেগম সমরু (সচিত্র)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৮। নকল পাঞ্জাবী (২য় সংস্করণ)—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।
১৯ বিল্বদল—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।
২০ ছোলদার বাড়ী (২য় সং)—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।
২১ মধুপর্ক—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।
২২ লীলার স্বপ্ন—শ্রীমনোমোহন রায়, বি-এ।
২৩ সুখের ঘর (২য় সং)—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, এম-এ।
২৪ মধুমল্লী—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।
২৫ রসির ডায়েরী—শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী।
২৬ ফুলের তোড়া—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।
২৭ ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
২৮ সীমন্তিনী—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।
২৯ নব্য-বিজ্ঞান—অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ।
৩০ নববর্ষের স্বপ্ন—শ্রীসরলা দেবী।

৩১। নীল মাণিক—রায় বাহাদুর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, ডি-লিট।
৩২। হিসাবনিকাশ—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল।
৩৩। মায়ের প্রসাদ (২য় সং)—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
৩৪। ইংরেজী কাব্যকথা—শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ
৩৫। জলছবি—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।
৩৬। শয়তানের দান—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।
৩৭। ব্রাহ্মণ-পরিবার—(২য় সংস্করণ) শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।
৩৮। পথে-বিপথে—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি-আই-ই।
৩৯। হরিশ ভাণ্ডারী (৩য় সংস্করণ) রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর।
৪০। কোন্ পথে—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, এম-এ।
৪১। পরিণাম—শ্রীগুরুদাস সরকার, এম-এ।
৪২। পল্লীরাণী—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
ভবানী—৺নিত্যকৃষ্ণ বসু।
৪৪। অমিয় উৎস—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।
৪৫। অপরিচিতা (২য় সং)—শ্রীপান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ।
৪৬। প্রত্যাবর্ত্তন—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বসুমতী-সম্পাদক।
৪৭। দ্বিতীয় পক্ষ—শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম্-এ, ডি-এল।
৪৮। ছবি (২য় সং)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৪৯। মনোরমা—শ্রীমতী সরসীবালা দেবী।
৫০। সুরেশের শিক্ষা (২য় সং)—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ।
৫১। নাচওয়ালী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ।
৫২। প্রেমের কথা—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ।
৫৩। গৃহহারা—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৫৪। দেওয়ানজী—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।
৫৫। কাঙ্গালের ঠাকুর (২য় সং)—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর।
৫৬। গৃহদেবী (২য় সংস্করণ)—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।
৫৭। হৈমবতী—৺চন্দ্রশেখর কর।
৫৮। বোঝাপড়া—শ্রীনরেন্দ্র দেব।
৫৯। বৈজ্ঞানিকের বিকৃত বুদ্ধি—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।
৬০। হারান ধন—শ্রীনসীরাম দেবশর্ম্মা।
৬১। গৃহ-কল্যাণী—শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল।